৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ▫ আনন্দবাজার প্রকাশন ▫ তিন টাকা

আপনার শিশুর চাই যত্ন এবং

'কেয়ো-কার্পিন' 'ম্যাসাজ অয়েল'

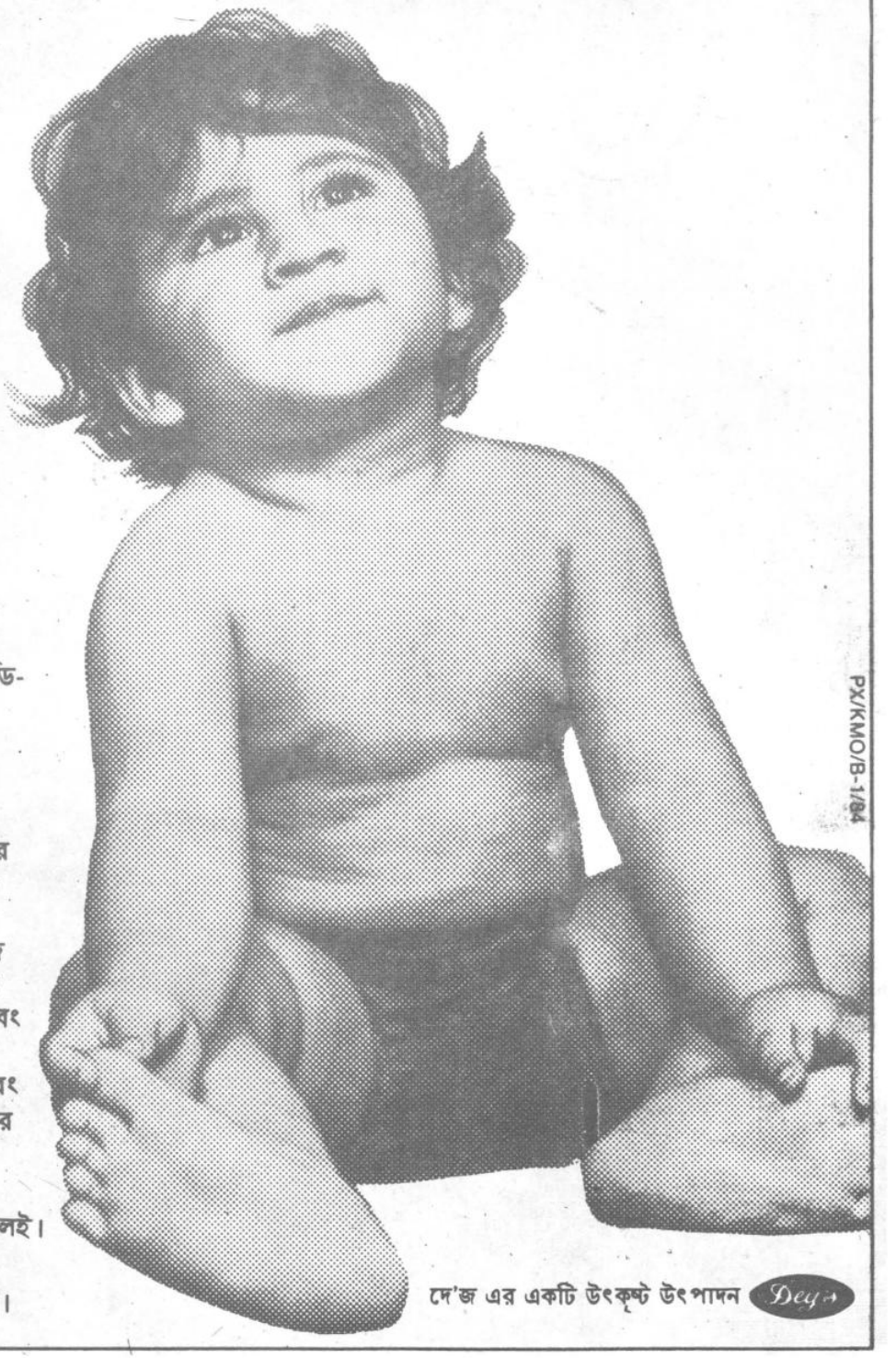

ভিটামিন ই, এ এবং ডি-
সমৃদ্ধ কেয়ো-কার্পিন
ম্যাসাজ অয়েল।

অতি কোমলভাবে
আপনার শিশুর ত্বকের
যত্ন ও পরিচর্যার জন্য
সব কিছুই রয়েছে
কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ
অয়েল এ। এর অলিভ
অয়েল, ল্যানোলিন এবং
চন্দন তেল মিশ্রিত
বেসে রয়েছে ই, এ এবং
ডি ভিটামিন। আপনার
শিশুর ত্বকে রেশমের
মত নরম মসৃণতা
আনতে পারে এই তেলই।

পরিবারের সকলের
জন্যই সমান উপকারী।

দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন Dey's

PX/KMO/B-1/84

আনন্দমেলা

১৪ কার্তিক ১৩৯১ । ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ । ১০ বর্ষ ৯ সংখ্যা

গল্প
ভুতুড়ে কাণ্ড । রতন ভট্টাচার্য ৯
মা । বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ১৫
শমীকের বুদ্ধি । সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
অভ্রর খুনি-ধরা । রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ৫৪
বীরপুরুষ । প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
ইতিহাসের গল্প
গোলাম কাদিরের কাণ্ড । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ২৪
কবিতা ও ছড়া
জোনাকির রাত । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৭
আসুন বসুন । সরল দে ৮
ট্রেনের সঙ্গী । সুদেষ্ণা সরকার ৮
রাজামশাই । তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ ৩২
জ্ঞানবান । কালিদাস ভট্টাচার্য ৩২
কাকা-কাহিনী । সুনির্মল চক্রবর্তী ৫৯
ওলিম্পিকের আসরে
'ওই তো নাদিয়া কোমানেচি' । সোমা দত্ত ৩৭
শার্লক হোমসের গল্পমালা
লালচুল সমিতি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৪০
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৪৩
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৭
মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল । শ্যামলকান্তি দাশ ২৬
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ২৭
খেলাধুলো
শিল্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল । অশোক রায় ৬২
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা । রাজা গুপ্ত ৬৪
রাজার সাজা । সম্রাট রায় ৬৫
একক লড়াইতে রাইস রাজা । নৃপতি চৌধুরী ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
বিজ্ঞান-বিচিত্রা
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
পশুরাও পশু পোষে । চঞ্চল পাল ৫১
অন্যান্য আকর্ষণ
একটি কবর আবিষ্কারের গল্প । প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ২৯
মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ৩০
তোমাদের পাতা ৪৯
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আগামী সংখ্যাই (১৪ নভেম্বর)
শিশু-দিবস সংখ্যা
এই সংখ্যায় থাকছে
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
অসাধারণ সুন্দর গল্প

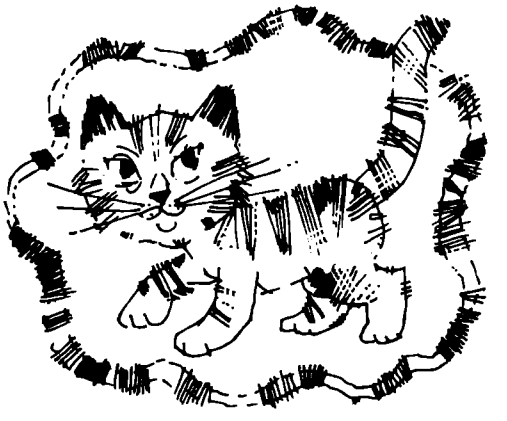

রুকু, সুকু ও পুসি

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের
তাক-লাগানো সচিত্র রচনা
কলকাতার পাতাল-রেল

কঙ্কাবতী দত্তের
সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস
নিশ্চিন্তপুরের রোমাঞ্চ

সেইসঙ্গে এই সংখ্যাতেই শুরু হচ্ছে
'শার্লক হোমসের গল্পমালা'র নতুন রহস্যকাহিনী
কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

আরও অজস্র আকর্ষণ

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার

বেশী সুস্বাদু বেশী সম্পূর্ণ

দুধ মেশানোই থাকে

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—**গ্ল্যাক্সো**

CLARION/BGX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই (FCM-3) **400 025**

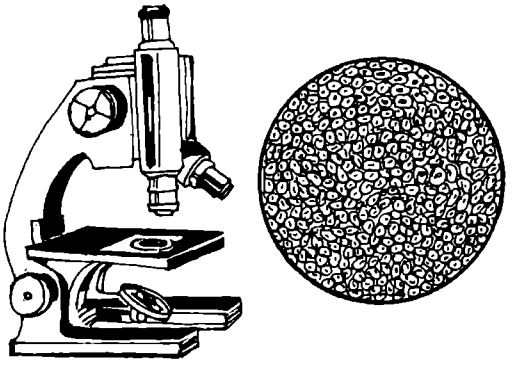

রক্ত কেন লাল

কারও হাত-পা কেটে বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেলে আমরা বলি, চারপাশটা রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু রক্তের রঙ লাল কেন? তাতে কী এমন পদার্থ আছে যাতে রক্ত অন্য কোনো রঙের না হয়ে একেবারে টকটকে লাল হয়।

রক্তে যত উপাদান, তার মধ্যে আছে লোহিত কণিকা আর শ্বেত কণিকা। এই লোহিত কণিকাই রক্তে লাল রঙ নিয়ে আসে। লোহিত কণিকায় এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে, নাম হিমোগ্লোবিন। এর বর্ণ লাল। হিমোগ্লোবিনের এই লাল রঙই রক্তকে লাল করে তোলে।

তাই শরীরের ভেতরের রক্ত কোনো কারণে যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন দেখি তা ভয় পাওয়ার মতো, খুব লাল।

দিন কেন ২৪ ঘন্টার

একটা দিন সকাল থেকে পরের দিন সকাল হতে কেন মোটামুটি ২৪ ঘন্টা সময় লাগে? শুধু সকাল থেকে সকাল নয়, দুপুর থেকে দুপুর বা বিকেল থেকে বিকেল হতে বা দিনের যে-কোনো সময় থেকে পরের দিন সেই সময় পর্যন্ত ঘুরে আসতে কেন সময় লাগে ২৪ ঘন্টা?

অর্থাৎ দিন কেন ২৪ ঘন্টার?

লাট্টু যেমন নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক খায়, তেমনি পৃথিবীও নিজের অক্ষকে অবলম্বন করে পাক খেয়ে চলে। পৃথিবীর এই অক্ষটা কাল্পনিক, যেন গেছে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর ভেতর দিয়ে। পৃথিবীর নিজের অক্ষকে অবলম্বন করে পাক মেরে আসতে যে সময় লাগে তা হল বলতে গেলে ২৪ ঘন্টা।

পৃথিবীর যে এই পাক মারা তা সূর্যকে সামনে রেখে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক দিয়ে। তাই সূর্যের সামনে পৃথিবীর যে দিক থাকে, সেই দিকেই তখন আলো, অন্যদিকে তখন অন্ধকার। অর্থাৎ সূর্যের সামনে দিন, পেছনে রাত। সেইজন্য আমেরিকায় যখন রাত্রি, আমাদের দেশে তখন দিনের আলো। আর আমাদের দেশে যখন দিনের আলো নিবে আসে, আমেরিকায় তখন ভোর, আলো ফুটে ওঠার সময়।

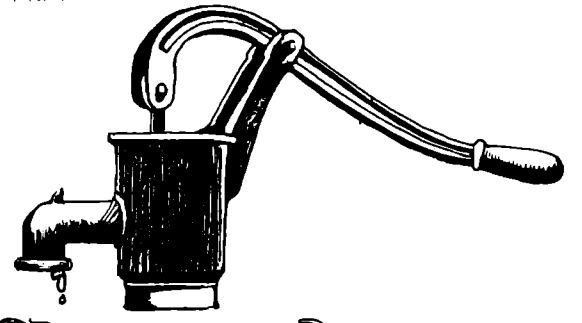

টিউবওয়েলের জল শীতে গরম আর গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা কেন

শীতকালে টিউবওয়েল পাম্প করলে যে জল উঠে আসে সে জল গরম লাগে কেন? অথচ গ্রীষ্মের দিনে পরিবেশ যখন উষ্ণ তখন টিউবওয়েলের জল ঠাণ্ডা মনে হয়। এর কারণ কী?

টিউবওয়েল থেকে যে জল তোলা হয় তা থাকে মাটির বেশ কিছুটা নীচে। লোহা যেমন আগুনের তাপে চট করে তেতে যায়, মাটি সে-রকম নয়। মাটি পারিপার্শ্বিক থেকে ততটা তাপ নেয় না। এইজন্যে মাটিকে বলা হয়, মাটি তাপের কুপরিবাহী। ফলে বাইরের বাতাসে যখন আগুনের হলকা বয়, তখন মাটির মধ্যে ততটা গরম থাকে না। কিংবা বাতাসে যখন কনকনে ভাব দেখা দেয়, তখনও ভেতরের মাটি ততটা ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে না।

তাই শীতকালে বাইরের বাতাসের তাপমাত্রার তুলনায় টিউবওয়েলের ভেতরের জলের উষ্ণতা বেশি। ফলে তখন টিউবওয়েল থেকে জল তুললে সে জল তো গরম বলে মনে হবেই। আর গরমের দিনে অবস্থাটা উলটো। তখন বাইরের বাতাসের উষ্ণতার চেয়ে মাটির নীচের উষ্ণতা কম থাকে। আর তাই সেই সময়ে টিউবওয়েলের জল ঠাণ্ডা লাগে।

আসলে টিউবওয়েলের জল মাটির গভীরে যেখানে থাকে, মাটি তেমন তাপ টানে না বলে, শীত-গ্রীষ্মের কোনো সময়েই সেই উষ্ণতার তেমন একটা পরিবর্তন হয় না। সেই জন্যে শীতে টিউবওয়েলের জল গরম, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত
ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয়
আর তা ছড়িয়ে
পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তার জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

ত্বকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের ছাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে ব্রণ হয় বা তা ছড়িয়ে পড়ে, তার এটি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে, ব্রণ শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ড্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3656 BEN

সহজে ইংরেজি

হায়দরাবাদ থেকে

Chameli loves writing letters to friends. She loves receiving letters from friends even more.

Chambal finds writing letters a bore.

But he too likes receiving letters.

One morning a fat envelope arrived for Chambal.

"Who can it be from?" he wondered.

Chameli too was very curious.

"Who is it from, Dada?" she asked.

"I don't know," he replied, "It's from Hyderabad. I can't think of anybody writing to me from Hyderabad."

"Isn't it exciting?" Milly cried, "I wish I'd get letters like that."

Chambal said, "Wishing is not enough. Who'd want to write to you?"

খাম খুলতে বেরোল তিনপাতার এক মস্ত চিঠি। চম্বল তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে নামসইটা দেখে নিল।

"Oh, I see," Chambal exclaimed, "Of course. I was forgetting about Aravind."

"Who's Aravind?" Milly asked. "I don't remember your saying anything about him ever."

"Aravind Mahidhara," Chambal replied, "The new boy in my class. He told me he was going back to his home in Hyderabad. Also promised to write. Only, I forget all about it."

Milly said, "I can't imagine somebody forgetting about his friends. Only boys would do that, I suppose. I never could.

চম্বলের বন্ধু লিখেছে তার বাবা-মার সঙ্গে সে কলকাতায় আসছে। এক দিন থেকেই কাঠমাণ্ডু চলে যাবে। কবে পৌঁছবে, কোন্ হোটেলে উঠবে, সব লিখে দিয়েছে। চম্বল যেন অবশ্যই হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে।

And so it came about that Mr. Chandramohan Mahidhara, Mrs. Sarala Mahidhara and their son Aravind spent a very pleasant evening with Chambal, Chameli and their parents. It turned out that Mr. Mahidhara was a ship's captain.

Naturally, both Chambal and Chameli had a whole lot of questions to ask him.

In answer to one of Milly's questions he said, "No, sailing in a ship hasn't many risks these days."

এবারে লক্ষ করো :

Writing, exciting, forgetting, saying, sailing, wishing.

ক্রিয়াপদের এই রূপটি নীচের বাক্যগুলিতে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে, যে কাজ চলছে, এমন কিছু বোঝায় না।

Chameli loves writing letters.

Isn't it exciting?

Wishing isn't enough.

I don't remember your saying anything.

I can't imagine somebody forgetting about his friends.

Sailing hasn't many risks these days.

সবশেষে, চামেলির যে-প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মহীধরা শেষের বাক্যটি বলেছিলেন, সেই প্রশ্নটি লিখতে পারো ?

প্রসাদ

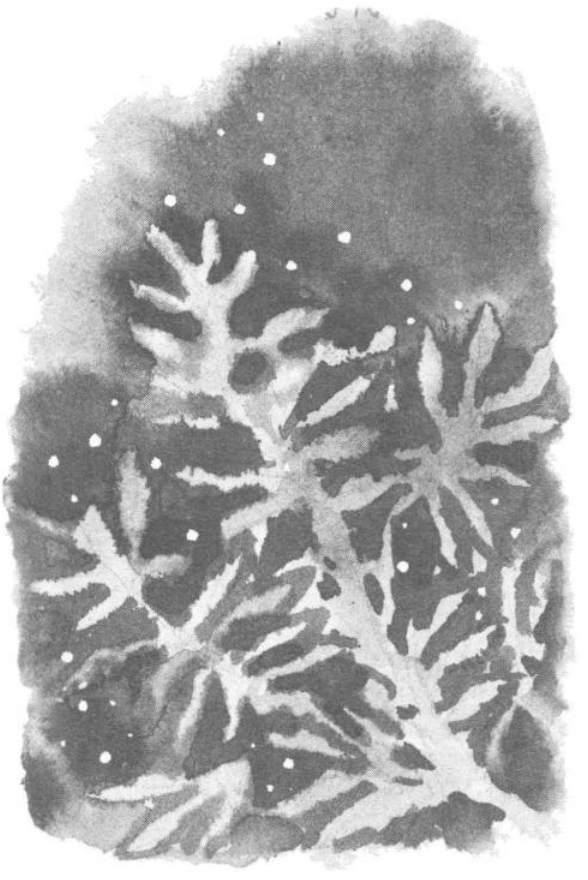

জোনাকির রাত

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পুজো চলে গেল রাতের আকাশে
উড়ন-তুবড়ি উড়িয়ে ;
শহরে ও গাঁয়ে, গলিতে ও ঘাসে
বোমা ও পটকা পুড়িয়ে।
জুটেছিল যারা পূজামণ্ডপে,
দেখি না তাদের টিকিও ;
কী নিয়ে কাটাব দিন বলো তবে,
শেষ পূজাবার্ষিকীও।

শেষ হয়ে গেল আলোর দেয়ালি,
এল হেমন্ত, দাদা রে,
আকাশে জমছে ধোঁয়াশাই খালি
সন্ধ্যারাতের আঁধারে।
সেই আঁধারেও আলো জ্বেলে যায়
চূর্ণ-চূর্ণ সোনা কি ?
তা তো নয়, নিমগাছের শাখায়
ঝিকমিক করে জোনাকি।

ছবি : দেবাশিস দেব

আসুন বসুন

সরল দে

আসুন আসুন প্রসূনবাবু,
বসুন বসুন বসুন।
এলেন যদি, খেয়ে যাবেন
দু-এক কোয়া রসুন।
কত যে গুণ সামান্য ঐ
রসুন দু-এক কোয়ার,
রক্তে ভাঁটা পড়লে আসে
নতুন করে জোয়ার।
মিষ্টি খেলে শুগার বাড়ে
অ্যাসিড বাড়ে ভাজায়,
অতিথ্ এলে কেন যে লোক
প্লেটে ওসব সাজায়।
বসুন বসুন টুলের ওপর
বসেই দু'পা নাড়ুন,
ততক্ষণে পড়েই ফেলি
গল্পটা এই দারুণ।
লেখক ভাল—সুবিখ্যাত
চিনা লেখক লো শুন।
আরে আরে ওঠেন কেন?
বসুন বসুন বসুন।

ছবি : দেবাশিস দেব

ট্রেনের সঙ্গী

সুদেষ্ণা সরকার

হুইসিল বাজতেই ট্রেন ছেড়ে দিল ঝুপ,
প্ল্যাটফর্ম পেরোতেই চারিদিক নিশ্চুপ।
টিমটিমে আলো জ্বলে, থমথমে কামরা,
মুখোমুখি বসে আছি দুইজনে আমরা।
তিনি যেন কীরকম, ভিনদেশী গন্ধ,
দেখলেই মনে জাগে ঘোরতর সন্দ।
লিকপিকে, টিংটিঙে, অতি সরু কায়া তার,
চেয়ে দেখি এই আছে, এই নেই ছায়া তার।
ধুলোপায়ে নাগরাই, শুঁড়খানা বাগানো,
মনে হল, গোড়ালিটা উল্টিয়ে লাগানো।
কানগুলো খাড়া-খাড়া, দাঁত ক'টা বেরিয়ে—
একমনে আমাকেই দেখছে সে টেরিয়ে।
যেই হল চোখাচোখি, একগাল হাসিয়া
বলে, "খোকা, জেনে রেখো, চিন থেকে রাশিয়া
বুড়োবুড়ি, খোকাখুকি, জোয়ান বা মদ্দ,
সকলেই একেবারে কাপুরুষ হদ্দ।
কেউ যদি ভূতেদের নাম করে লুকিয়ে,
অমনিই বাছাদের মুখ যায় শুকিয়ে।
তুমিও কি ভিতুরাম, ভয়ে যাও মুর্ছো?"
আমি বলি, "ভূতে ভয়! আরে রাম, দূর ছো!
বিজ্ঞান পড়ি আমি, ভূতে নেই বিশ্বাস।"
যেই বলা, অমনি সে সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলে বলে কাঁচুমাচু, "আঁমিও তোঁ মাঁনি নাঁ।"
বলেই যে কোন্‌খানে উবে গেল জানি না।

ভুতুড়ে কাণ্ড

রতন ভট্টাচার্য

ঘন্টা-দুয়েক ধরে একটানা মুষলধারে বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টি আর হাওয়া। জানলার শিকে মুখ চেপে ঝড়বৃষ্টি দেখতে দেখতে বিকাশ বলে উঠল, "ভুতুড়ে কাণ্ড ! বৃষ্টি কি আজ ধরবে না স্যার ?"

স্যার মানে কিঙ্করস্যার। স্কুল ছুটির পর ওঁর কাছে আমরা প্রাইভেট পড়ি। তিনটে মেয়েও আছে ব্যাচে আমাদের। সপ্তাহে তিনদিন উনি আমাদের অঙ্ক শেখান। সোম বুধ এবং শনি। এই তিনদিন আমরা বাড়ি থেকে টিফিন আনি। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। টিফিন খেয়ে আমরা অঙ্ক শিখতে বসি। আজও বসেছিলাম। তারপর এই বৃষ্টি। ভাগ্যিস মেয়ে তিনটে আগেই চলে গিয়েছিল। কিঙ্করস্যার বললেন, "তোর আর বুদ্ধি হল না বিকাশ। বৃষ্টি হঠাৎ ভুতুড়ে কাণ্ড হতে যাবে কেন ? ভিজে জাব হয়ে গেলি। সরে আয়। বোস চুপ করে সামনে এসে।"

বিকাশের ইচ্ছে ছিল না জানলা থেকে সরে আসে। কিন্তু স্যার ডাকছেন। না এসেও পারল না। কাঁচুমাচু মুখে হেসে বেঞ্চিতে বসতে বসতে সে বলল, "কী করে বাড়ি যাব ?"

"সে-ভাবনা বৃষ্টি থামলে করা যাবে।" স্যার হাসলেন, "বল দেখি কীরকম ঘটনার পর বললে তোর ওই ভুতুড়ে কাণ্ড কথাটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হত ?"

বিকাশ বলতে পারল না। বোকার মতো দু'হাতে মাথা চুলকোতে লাগল। স্যার নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন। নন্দ বলল, "ভূতেদের করা যে-কোনো কাণ্ডকে ভুতুড়ে কাণ্ড বলা যায়।"

"দূর ! ভূতেরা হঠাৎ কাণ্ড করতে যাবে কেন ?" বলে স্যার আমার দিকে তাকালেন। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। উল্টে একটা প্রশ্ন করে বসলাম, "আচ্ছা স্যার, ভূত বলে কিছু আছে ? আপনি বিশ্বাস করেন ?"

টেবিলের ওপর পা তুলে বসেছিলেন উনি। আমার প্রশ্ন শুনে পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসলেন। এক টিপ নস্যি নিয়ে রুমাল বার করে নাক ও জামা থেকে নস্যির গুঁড়ো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "আমার বিশ্বাস হয় না ভুত বলে কিছু আছে," এক মুহূর্ত থামলেন উনি। "ভূত নেই বটে, তবে ভুতুড়ে কাণ্ড আছে। আর আছে আমাদের এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না এমন একটা আলাদা জগৎ।"

"আলাদা জগৎ !"

"হ্যাঁ। আলাদা জগৎ। কিছু-কিছু মানুষ জন্ম থেকেই একটা আলাদা চোখ নিয়ে জন্মান। বিশাল মানুষ তাঁরা। যেমন রবীন্দ্রনাথ। যেমন আইনস্টাইন, রামকৃষ্ণ। শুধু ওঁরা দেখেন সেই জগৎ। ওঁদের লেখা পড়লে, ওঁদের জ্ঞানগম্যির কথা বোঝা যায়। ওঁরা সেই জগৎটাকে সর্বদা চোখের সামনে দেখতে পেতেন।"

নন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, ওঁরা ভূত দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ।" কিঙ্করস্যার হেসে ফেললেন। "ওঁরা ভূত ভবিষ্যৎ সব দেখেছেন। তোরা দেখেছিস ?"

কেউ কিছু বলার আগেই বিকাশ হাত তুলে বলে উঠল, "আমি, আমি দেখেছি।" বিকাশটা ওইরকম। প্রাইভেট পড়তে বসেও কিছু বলার আগে ওর হাত তোলা চাই।

"তাই নাকি ! খুব ভাল হয়েছে।" উৎসাহিত হয়ে উঠলেন কিঙ্করস্যার। "বৃষ্টি যখন থামার নাম নেই তখন ভূতের গল্প হোক। কোথায় ভূত দেখলি তুই ?"

"রাত্তিরবেলা মাসিবাড়ি থেকে ফিরছিলুম, দেখি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।" "বাঃ ! খুব জমবে। এই তো ঠিক ভূতের গল্পের পরিবেশ। শুনেছি এ বাড়িটাতে ভূত আছে। নির্জন ভুতুড়ে স্কুল বিল্ডিং, মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার। শুরু করে দে বিকাশ ! তোর ভূত দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা শুনি আমরা।"

কিঙ্করস্যার হাতে ঘড়ি পরেন না। বেলা আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না কিছু। ঝড়বৃষ্টি সমানে চলছে। বাইরের আলো কীরকম ঘোলা। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। আমাদের স্কুল গ্রামের বাইরে মাঠের ওপর। আসলে এটা ছিল ভুঁইঞা জমিদারদের কাছারিবাড়ি। ওপরে নীচে উল্টোপাল্টা ঘর বাড়িয়ে এখন স্কুল। সামনে চার-পাঁচ মাইল লম্বা মাঠ। মাঠের অনেকখানি জুড়ে গরমের ধানগাছ। কোথাও লোকজন নেই। কতগুলো বাবলাগাছ এক জায়গায় জড়ো হয়ে ভিজছে। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। কয়লার উনুনে আঁচ দিলে যেরকম গন্ধ ছাড়ে, বৃষ্টিভেজা সেইরকম গন্ধ এসে নাকে লাগল। বোঝা গেল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই বাহাদুর ঘরে আঁচ ধরিয়েছে। গল্প বলার জন্যে বিকাশ উঠে দাঁড়িয়েছিল। রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে কিঙ্করস্যার বললেন, "উঠতে হবে না রে। বসে বসে বল্।"

ঝপ করে বসে পড়ল বিকাশ। বসে শুরু করল, "আমার মাসিবাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি আসতে একটা মাঠ পড়ে। ছোট মাঠ। দু'দিকের ঘরবাড়ি দেখা যায়। সবাই বলে হসপিটাল মাঠ। মাঝখানে গোটা-দুই ডোবা আর একটা লম্বা বিশাল বুনো জামগাছ। এছাড়া কোথাও কিছু নেই। এখানে-ওখানে আগাছা আছে। বনতুলসী, ভ্যারেণ্ডা। কিন্তু বড় গাছ নেই। রাত্তিরবেলা যখনই আমি মাসিবাড়ি থেকে ফিরতুম, ওই জায়গাটায় এলে আমার গা ছমছম করে উঠত। একদিন, রাত তখন নটা হবে, মাসিবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, অল্প জ্যোৎস্না আছে, দেখি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে জামগাছতলায়। দাঁড়িয়ে পড়লুম। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে ? কে ওখানে ?' কোনো উত্তর নেই। উত্তর না পেয়ে কিছু বুঝতে বাকি থাকল না। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চেঁচাতে গেলুম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। পেছন ফিরে ছুটতে চাইলুম, পা উঠল না। সে অবস্থা, স্যার, বোঝাতে পারব না আমি। কেরোসিন।"

কিঙ্করস্যার হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি ?"

"না স্যার," অপ্রস্তুত মুখে বিকাশ বলল, "মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।"

"কী বললি বল্ না আবার।"

"অবস্থার কথা স্যার। অবস্থা কেরোসিন হয়ে গিয়েছিল।"

কিঙ্করস্যার খানিকটা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন আগের ঘটনা ?"

"হ্যাঁ, তা হল। আমি তখন সিক্সে পড়ি। অ্যানুয়ালি পরীক্ষার অল্প বাকি আছে।"

"আবার অ্যানুয়ালি ?" মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন কিঙ্করস্যার। "তোর কিছু হবে না বিকাশ। কতবার বলে দিয়েছি, অ্যানুয়াল। হাফ ইয়ার্লি কিন্তু অ্যানুয়াল। নে। বল। তারপর কী হল ?"

"ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভূতও দাঁড়িয়ে, আমিও। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম কে জানে। শেষে দূর থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে দেখলুম। আমার দেরি দেখে বাবা হারিকেন নিয়ে মাসিবাড়ি যাচ্ছিলেন, সেই আলো। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কী রে ! তুই এখানে মাঠের মধ্যে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ?' বাবার এই কথাটা শুধু কানে গিয়েছিল আমার, তারপর আর কিছু মনে নেই। বাবা আমাকে কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাড়ি ফিরে ধুম জ্বর।"

"জ্বর হয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ স্যার। এক সাধুবাবার জলপড়া খেয়ে ভাল হই। ভাল হবার পর সব শুনে বাবা বলেছিলেন, 'খুব বেঁচে গেছিস। মাঠটায় মানুষভূত আছে জানতুম না তো। শুনেছিলুম গুমো আছে।'"

"গুমো !" অবাক হয়ে স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "গুমো কী ?"

"গো- ভূত স্যার। লেজ তুলে জ্যোৎস্না রাতে মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করে। আর সর্বক্ষণ রূপ পাল্টায়। এই বাছুর, এই গোরু।"

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করতে করতে কিঙ্করস্যার আমাদের দিকে তাকালেন। "এই, এবার তোদের এক্সপিরিয়েন্স বল।"

আমি বললাম, "আমি কখনও ভূত দেখিনি স্যার।"

নন্দ বলল, "আমিও দেখিনি। তবে একজনের কাছ থেকে সদ্য-সদ্য ভূত দেখার গল্প শুনেছিলুম।"

"ঠিক আছে। সেইটাই শোনা," নস্যির টিপ নাকে ঠেসে স্যার বললেন, "আজ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নিজের ভূত, পরের ভূত, সব অ্যালাও। নে। আরম্ভ কর।"

"আমার মামার গল্প স্যার।" নন্দ শুরু করল, "দুপুর থেকে মামির অবস্থা খারাপ। শ্বাস উঠে গেছে। মাইল-দেড়েক দূরে হাটে মামার মুদিখানার দোকান। মামা বললেন, 'আমি বসে থেকে কী করব ? দোকানে যাই। হয়ে গেলে আমায় খবর দিস।' মামি মারা গেলেন রাত পৌনে নটায়। মামার তখন দোকান বন্ধ করে ফিরে আসার সময়। কাজেই কেউ আর খবর দিতে গেল না। হারিকেন হাতে নিশ্চিন্ত মনে মামা দোকান থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখলেন বাড়ির একটু আগে মামি দাঁড়িয়ে আছেন বাঁশতলায়। ফিরতে দেরি হলে মামি এরকম বাঁশতলায় এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন অনেক সময়। কিন্তু আজ কী করে সম্ভব ? মামা ভাবলেন, দুপুর বেলা যার শ্বাস উঠে গিয়েছিল, সে কী করে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর ? তবু কিছুতেই ভাবতে পারলেন না যে মামি মারা গেছেন। বললেন, 'তুমি ! তুমি এখানে !' মামি বললেন, 'কেন ? নতুন দাঁড়াচ্ছি ?' মামা বলেনন, 'তা নয়। তোমার অত অসুখ দেখে গেলুম।' মামি বললেন, 'অসুখ সেরে গেছে।' কথা বলতে বলতে খানিকটা আসার পর মামা হঠাৎ বাড়ি থেকে কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পান। জিজ্ঞেস করেন, 'কাঁদছে কে গো ?' জিজ্ঞেস করে ফিরে চেয়ে মামা দেখেন মামি রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের জঙ্গল আর আঁস্তাকুড়ের দিকে চলে যাচ্ছেন। মামা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই ! তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?' কোনো উত্তর নেই। আর দেখাও গেল না মামিকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। তখন অবস্থাটা একবার ভাবুন স্যার মামার। ভয় পেয়ে পাগলের মতো ছুটছেন বাড়ির দিকে। হাতের হারিকেন নিভে গেছে। পায়ে কাপড়টাপড় জড়িয়ে সে একখানা আস্ত কেলো।"

"কেলো মানে ?"

"কেলো মানে কেলেঙ্কারি। খুব কেলেঙ্কারি হল স্যার। অবশ্য ওই মামিকে পরেও অনেকবার দেখা গেছে। মামা আবার বিয়ে করেছিলেন। সেই নতুনমামি তো প্রায়ই দেখতেন। মামার একটা মেয়ে ছিল। মেয়েটা সন্ধেবেলা হয়তো একলা খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, নতুনমামি এসে দেখলেন ঘরে চেয়ার পেতে মামি পাহারা দিচ্ছেন মেয়েকে।"

"তুই এত সব জানলি কী করে ?"

"আমি তো তখন স্যার মামাবাড়িতেই থাকি। একেবারে বাচ্চা। কিন্তু মনে আছে সব।"

কিঙ্করস্যার সিধে হয়ে বসলেন। বললেন, "হ্যাঁ রে, এবার কী হবে ? স্টক ফুরিয়ে গেল। রতনটা ভূত দেখেনি। এদিকে বৃষ্টিও থামছে না।"

বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে বলল, "এবারে স্যার আমরা আপনার এক্সপিরিয়েন্স শুনব।"

"তা শুনবি। কিন্তু আমি যে ভূত দেখিনি। বিশ্বাসও করি না ভূত আছে। তবে তোদের একটা ভুতুড়ে কাণ্ডের গল্প বলতে পারি। ভূত নেই বটে, কিন্তু ভুতুড়ে কাণ্ড আছে।"

"তাই বলুন স্যার।"

"বেশ, শোন্ তবে। অনেক কালের কথা। তখন আমার বছর-কুড়ি বয়েস। সবে বি এসসি পরীক্ষা দিয়েছি। একদিন বাড়ি ফাঁকা করে সবাই কলকাতা চলে গেল। বিয়ের নেমন্তন্ন। আমার মাসির বিয়ে। আমি গেলুম না। বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে থাকতে হল। একটা বন্ধুকে আমার সঙ্গে শুতে বললুম। রাত্রিবেলা ফাঁকা বাড়িতে একলা থাকতে কীরকম ভয়-ভয় করে। বন্ধুটার নাম চাঁদু। আমার ঘর ছিল নীচে রাস্তার ধারে। চাঁদু এলে আমি চারদিক দেখেটেখে বন্ধ করে ঘরে ঢুকলাম। শুতে যাব, হঠাৎ রাস্তার ওপর তিন-চারজন লোক অমানুষিক গলায় 'বাবা রে, মা রে' করে বিকট চিৎকার করে উঠল। রাত তখন এগারোটার কম না। ঠিক আমাদের ঘরের পাশে এই চিৎকার। বুক কেঁপে উঠল। তা সত্ত্বেও সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ নিয়ে ছুটে গেলুম দু'জনে। তাড়াতাড়ি হবে বলে খিড়কির পাঁচিল ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়লুম। চারদিক থেকে আরও লোকজন ছুটে এল। দেখলুম চারটে তাগড়া জোয়ান লোক ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। চোখ ঠিকরে আসছে। হাউমাউ করে তারা বলল, একটা অদ্ভুত জন্তু অন্ধকার থেকে লাফ মেরে তাদের সামনে এসে পড়েছিল। জন্তুটার সারা গায়ে চুল। এমনকী মুখেও। চোখ দুটো ঢেলার মতো বেরিয়ে আছে। মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। বলল, এমন কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার জীবনে দেখিনি। মেরেই ফেলত, শুধু হঠাৎ চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ফেলায় বাঁ দিকের মাঠে নেমে সরকারদের ডাঙার দিকে চলে গেল।

"হট্টগোল মিটতে আধঘন্টার মতো লাগল। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম। এক খাটে শুয়েছি দুজনে। আমি ধারের দিকে, চাঁদু ভেতরে। ঠিক ঘুমুইনি, দু'চোখ বোজায় তন্দ্রার মতো এসেছে, তখন হঠাৎ দেখতে পেলুম নিঃশব্দে দরজা খুলে সেই বিকট জন্তুটা ঘরে ঢুকছে। চোখ দুটো ঢেলার মতো। মুখে আগুনের হল্কা। ঠিক যেমন ওরা বলেছিল। ভয়ে অসাড় হয়ে গেল হাত-পা আমার। চিৎকার করে উঠতে গেলুম, চাঁদুকে ডাকতে চাইলুম, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। জন্তুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার মুখের ওপর তার মুখ। আগুনের হল্কা লাগছে মুখে আমার। এই অসহ্য অবস্থা আর সহ্য করতে পারছিলুম না আমি। হঠাৎ কোত্থেকে গায়ে জোর এসে গেল কে জানে। দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে চেপে ধরলাম জন্তুটার গলা। এত জোরে টিপলাম যে তার গলা দিয়ে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। আবছা টের পেলাম চাঁদু আমাকে ঠেলছে। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙছে না। জন্তুটার গলাও ছাড়ছি না আমি। শেষ পর্যন্ত চাঁদু আমাকে দুমদাম লাথি মেরে খাট থেকে ফেলে দিল। মশারি ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেলাম আমি। চাঁদুও নেমে এল। ঘরের কমিয়ে-রাখা আলো বাড়িয়ে দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা চোখে চাঁদু চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে তোর ? কিঙ্কর ! এই কিঙ্কর ! কী হয়েছে ?' আমি হাউমাউ করে বলে উঠলুম, 'চাঁদু সেই জন্তুটা। আমি তার গলা টিপে ধরেছিলুম।' চাঁদু অদ্ভুতগলায় বলল, 'কিসের জন্তু ? তুই আমার গলা টিপে ধরেছিলি।' রোগা পট্‌কা চেহারায় অত জোর পেলি কোত্থেকে ? কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। আর একটু হলে মরে যেতুম।'"

"বন্ধুর গলা টিপে ধরেছিলেন আপনি ?" আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "জন্তুটার না, বন্ধুর ?"

"বুঝলি তো, একেই বলে ভুতুড়ে কাণ্ড। ভূত নেই। কিন্তু···।" কিঙ্করস্যারের কথা শেষ হল না। বাইরে কোথাও একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই মনে হল অন্ধকার বারান্দায় পাখা নেড়ে ক্রমাগত কিছু একটা উড়ছে। অকস্মাৎ ঘরের দরজা-জানালাগুলোও দুমদাম শব্দে বার-কয়েক বন্ধ হল এবং খুলে গেল। শেষে দেখা গেল ঘরের খোলা দরজায় আবছা অন্ধকারে বুড়ো বাহাদুর এসে দাঁড়িয়েছে। তার খালি গা, পরনে খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট। গায়ে কোথাও লোম নেই। ভাঙা মুখে অজস্র রেখার আঁকিবুকি। চমকে উঠলাম আমরা। বাহাদুর ক'মুহূর্ত দেখল আমাদের। তারপর তার নিজস্ব খোনা গলায় স্যারকে উদ্দেশ করে বলল, "আপনার কহানীটা আমি শুনলো মাস্টারসাব। হাঁ। বহোত আচ্ছা কহানী। লেকিন আপনার ও বাত আমি মানলোম না। ভূত হ্যায় মাস্টার সাব্। জরুর হ্যায়। ভূতভি হ্যায় আউর···।" বাহাদুর কথা বলছিল আর আমি তাকে দেখছিলাম। তার দাঁত দেখা যাচ্ছিল। আমার মনে হল কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তার দাঁত খটখট করে নড়ছে। তার ঘর স্কুল-বিল্ডিং-এর বাইরে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সে তার ঘর থেকে লন পেরিয়ে স্কুল-বিল্ডিং-এ এসেছে। এই ঝড়বৃষ্টিতে ছাতা থাকলেও আগাপাশতলা ভিজে যাবার কথা। কিন্তু দেখলাম বুড়োর মাথায় গায়ে কোথাও একফোঁটা জল নেই। পা থেকে কোমর পর্যন্ত খাকি প্যান্টটা শুকনো খটখটে। ভুতুড়ে কাণ্ড। এই ভুতুড়ে কাণ্ড আর কারও চোখে পড়েছে কি না বুঝতে পারলুম না। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া এক ঝলক ঝড়ের বাতাসে আপাদমস্তক কেঁপে উঠলুম আমি।

ছবি : দেবাশিস দেব

পেনাল্‌টি

গ্যালারীতে ছিলেন দাদু, যেন ভিজে বেড়ালটি
হঠাৎ দারুণ লাফিয়ে উঠে হেঁকে বলেন, পেনাল্‌টি
অম্‌নি এমন কান্ড বাধায় ছোকরারা সব তুলকালাম
রেফারিটি বাজিয়ে বাঁশী বলেন, বাবা, থামরে থাম ।
খেলা এখন শেষের পথে, বল রয়েছে মাঝ মাঠেই
কোন আক্কেলে বল্‌তো দাদা পেনাল্‌টি কিক্‌ মারতে দেই ?
সবাই তখন ঘাবড়ে গেল, সত্যিই তো ঠিক কথাই
ফাউল টাউল কিচ্ছুটি নেই, ওঠে না এ প্রশ্নটাই ।
বাগিয়ে ছাতা, লাফিয়ে দাদু, রেগে ভোলেন দিগ্বিদিক,
বুদ্ধু যত, নিচ্ছ মেনে ? ভাবছ মনে এটাই ঠিক ?
দেখলে না ঐ সূয্যি ব্যাটা করলে ফাউল অবিশ্রাম !
আহা কচি প্লেয়ারগুলোর দরদরিয়ে ঝরলো ঘাম !
হিসেব করে দেখলে কি কেউ এনার্জি ক্ষয় ক'বাল্‌টি
শুক্‌নো ত্বক আর ঝলসানো মুখ, তবুও কি নয় পেনাল্‌টি ?
এই না বলে দাদু 'ফায়ার', বের করেন এক সবুজ টিউব
হাতে মুখে লাগা তোরা, বুড়ো হলেও নই বেকুব !
রোদের ক্ষতি পূরণ হবে, জিতবেই ঠিক আসছে দিন
ছেলেখেলা নয়কো বাবা ! এর নাম হুঁ বোরোলীন !

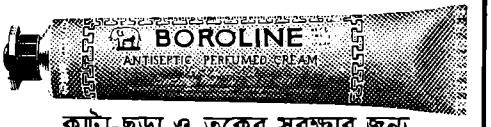

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

GDP-5241

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন, কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। এখানে এককড়ি নামে একজন লোক রান্নার কাজ করে, সে বেশ পাগলাটে ধরনের। জ্যাঠামশাই কোথায় গেছেন, তা সে জানে মনে হয়, কিন্তু বলতে চায় না। এখানে এমন কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে, দিপু যার মানে বুঝতে পারে না। রাত্তিরবেলা দিপু দিদিকে কিছু না-জানিয়ে চুপি-চুপি পুকুরঘাটের কাছে গিয়ে রহস্যময় একজন মানুষের দেখা পায়। সকালে দিপুকে না-দেখে ইরানি যাকেই জিজ্ঞেস করে, সে-ই গোলমেলে উত্তর দেয়। ইরানি এবারে থানায় যাবে। তারপর...

মুরশেদ বলল, "থানায় গিয়ে কী লবডঙ্কা হবে ? এ কি সিঁদকাটা কিংবা গোরুচুরির ব্যাপার ? মাঝরাত্তিরে এই পুকুরঘাটে এসে দাঁড়িও, তার যদি দেখা পাও !"

এককড়ি বলল, "তুমি কি কাল মাঝরাত্তিরে এসেছিলে ?"

মুরশেদ দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না গো, না ! আমি চাইলেও আসতে পারি না। পেছন থেকে চুল টেনে ধরে।"

ইরানি কেষ্টকে বলল, "বললুম যে, আমি থানায় যাব।"

কেষ্ট বলল, "হ্যাঁ, তা তো থানায় যেতেই হবে। আর উপায় কী ? এককড়ি, তুমি দিদিমণিকে থানায় নিয়ে যাও !"

এককড়ি চমকে উঠে বলল, "আমি ? ওরে বাপ রে, আমি থানা-টানায় যাই না !"

কেষ্ট বলল, "তোমায় তো এমনিই যেতে হবে। কাল দারোগাবাবু হুকুম দিয়ে গেছেন না ? না গেলে তোমায় হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে বলেছে !"

ইরানি কেষ্টকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যাবেন না ?"

কেষ্ট বলল, "আমি বরং এখানটায় থাকি। যদি খোকাবাবু এসে পড়ে ...আমার তো মনে হয় এদিক-সেদিক গেছে, গাঁয়ের দিকেও যেতে পারে।"

মুরশেদ বলল, "সে-গুড়ে বালি ! থানাতেও পাবে না, গাঁয়েতেও পাবে না।"

ইরানি এককড়িকে বলল, "চলুন !"

এককড়ি বলল, "আসছি, একটুখানি দাঁড়াও !"

এক দৌড়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু বাদেই ফিরে এল। কাঁধে একটা গেরুয়া চাদর, হাতে একটা পুঁটুলি।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, "ও সব কী নিয়ে যাচ্ছ ?"

এককড়ি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল, "তোমাদের কোনো সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছি না ! আমায় কি চোর ঠাউরেছ ? আমি কালী-সাধক ! থানায় গেলেই তো আমায় গারদে ভরে দেবে। সেখানে আমার পান-সুপুরি নিয়ে যেতে হবে না ? চলো তো দিদিমণি !"

লম্বা তালগাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে ওরা এসে পড়ল গ্রামের রাস্তায়।

ইরানির বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল করছে। সত্যিই দিপু নেই ? সে বারবার ফিরে তাকাতে লাগল পেছন দিকে। যেন দিপু ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে, এক্ষুনি বেরিয়ে এসে হাসবে।

খানিকটা যাওয়ার পর ইরানি জিজ্ঞেস করল, "থানা কত দূরে ?"

এককড়ি বলল, "তা একটু দূর আছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলে সংক্ষেপ হয়। তুমি কি মাঠ দিয়ে হাঁটতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, পারব।"

"ডান দিকে নেমে পড়ো তা হলে। আলের ওপর দিয়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে দেখেশুনে হাঁটো, সাপখোপ থাকতে পারে।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? সত্যি উত্তর দেবেন ?"

"বলো, দিদিমণি। সত্যি কথা বলব না কেন ?"

"আপনি কি সত্যি পাগল, না ইচ্ছে করে পাগল সাজার ভান করেন ?"

"এই দ্যাখো ! আমি সত্যিকারের পাগলও নই, সেজেও থাকি না। আমি এই রকমই।"

"তবে তখন বললেন কেন, তিনটে গাছ পাজি ? গাছেদের মধ্যে তিনটে পাজি তিনটে ভাল, এরকম আবার হয় নাকি ?"

"ও তুমি বুঝবে না দিদিমণি। তোমার ভাই খানিকটা বুঝেছিল। ও-সব বোঝবার জন্য আলাদা চোখ চাই। একটা তক্ষক ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ ?"

"তক্ষক কী ?"

"তাও জানো না। গিরগিটি দেখেছ তো ? বড় গিরগিটির মতন এক ধরনের সাপ। ভয়ের কিছু নেই। অনেক দূরে আছে। ওই যে সামনে অশথগাছটা দেখছ, ওর কোটরে বসে ডাকছে। ঐ তক্ষকটা আসলে এই মাত্র আমায় একটা কথা বলল। আমায় সাবধান করে দিল। এখন এটা তুমি বিশ্বাস করতেও পারো, নাও পারো।"

"আপনি কি আমাকে রূপকথা শোনাচ্ছেন ? রূপকথায় জন্তু-জানোয়ারেরা কথা বলে।"

"হে, হে, হে, হে ! ভাল বলেছ ! বুঝলে দিদিমণি, আমাদের মতন মানুষের কাছে এই জীবনটাই রূপকথা !"

"তক্ষক কী বলল আপনাকে ?"

"বলল, ওহে এককড়ি, আজ একাদশী, আজ থানায় যেও না। গেলে তোমার বিপদ হবে !"

এত দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যেও ইরানি হেসে ফেলল !

এককড়ি কিন্তু ঘোরালো মুখ করে বলল, "হাসলে তো ? বিশ্বাস হল না ? তোমরা শহরের লোক, অনেক কিছু মানো না !"

"থানায় গেলে আপনার বিপদ হবে, তা এতদূরে বসে ঐ তক্ষক জানল কী করে ?"

"ভূমিকম্প হবার অনেক আগে পিঁপড়েরা তা টের পেয়ে যায়। মানুষ যা জানতে পারে না, তা পিঁপড়ের মতন ঐটুকু প্রাণী জানতে পারে কী করে ?"

"আপনি পশুপাখিদের ভাষা বোঝেন ?"

"এক-এক সময় বুঝি। এক-এক সময় বুঝি না।"

"কার কাছে শিখেছেন ?"

"ও শিখতে হয় না। মনটা যখন চাঙ্গা থাকে, তখন আপনা-আপনি সব টের পাওয়া যায়।"

"আমি এরকম কথা আগে কক্ষনো শুনিনি। তবে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। রামায়ণে পড়েছি, রামচন্দ্র বনের পশুপাখি, গাছপালাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সীতা কোথায় ! আপনি যখন ওদের ভাষা বোঝেন, তা হলে ওই তক্ষকটাকে জিজ্ঞেস করুন না, দিপু কোথায় গেছে ?"

"সে কোথায় গেছে, তা তো আমি বুঝেই গেছি। কিন্তু বলবার উপায় নেই যে !"

"তার মানে ? দিপু কোথায় আছে তা জেনেও আপনি বলবেন না ? শুধু শুধু আমায় থানায় নিয়ে যাচ্ছেন !"

"থানায় তো তুমিই ইচ্ছে করে যেতে চাইলে। আমি তো যাবার কথা বলিনি।"

"দিপু কোথায় ?"

"সে-কথা বলার উপায় থাকলে তো বলতুমই। বলতে গেলেই ওনারা আমার গলা চেপে ধরবে।"

"ওনারা ? কারা ?"

"সেকথাও বলা যাবে না। সব কথা কি আর সব সময় বলা যায় ?"

"আপনি আমাকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন ?"

"ভূত মোটেও নয়। এখেনে একটু দাঁড়াও। তুমি যখন বললে, তখন একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।"

মাঠের মধ্যে একলা একটা অশথগাছ দাঁড়িয়ে। ওরা তার কাছে এসে পৌঁছেছে।

এককড়ি তার মুখের দু'পাশে দু'হাত দিয়ে অদ্ভুতভাবে আওয়াজ করল, "তক্ষো ! তক্ষো !"

সঙ্গে-সঙ্গে গাছের কোনো এক জায়গা থেকে ঠিক সেইরকম আওয়াজ এল : তক্ষো, তক্ষো, তক্ষো !

ইরানির সারা গা শিউরে উঠল একবার।

এককড়ির মুখে একগাল হাসি। ইরানির হাত ধরে বলল,"কী উত্তর দিয়েছে জানো ! বলল, তোমার ভাই ভাল আছে, চিন্তা কোরো না ! আমিও তাই জানতুম। ওরা ছোট ছেলেদের কোনো ক্ষতি করে না।"

ইরানি আর চোখের জল আটকাতে পারল না। হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে বলল, "আপনি...আপনি একটা খারাপ লোক...অকৃতজ্ঞ...আমার জ্যাঠামশাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন এইভাবে ? দিপু কোথায় আছে তা জেনেও আপনি আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন না ?"

এককড়ি তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "ও কী দিদিমণি, তুমি কাঁদছ কেন ? আমি কি ইচ্ছে করে তোমায় কষ্ট দিতে চাই ? আমার উপায় নেই যে। ওই সব কথা বলতে গেলেই আমার জিভ আটকে যায়। বিশ্বাস করো। আমি যদি জোর করে বলার চেষ্টা করি, তা হলে আমার কী হবে জানো ? একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে যাবে। এসব হল তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার, এসব নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। মুরশেদমাস্টার তো ঐ করতে গিয়েই পাগল হয়ে গেছে !"

"দিপুকে নিয়ে আজ সকালেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব ভেবেছিলুম।"

"আজ না হয় কাল যাবে।"

"দিপু কোথায় ? আপনাকে বলতেই হবে !"

আচমকা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল এককড়ি। সেই অবস্থাতেই হাতজোড় করে বলতে লাগল, "আমায় ক্ষমা করো, দিদিমণি। ক্ষমা করো ! এইটুকুন শুধু বলি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি চলে যাচ্ছি, আর আমার মুখ দেখতে হবে না তোমাকে !"

"আপনি চলে যাবেন মানে ? আমি থানায় পৌঁছব কী করে ?"

"ওই যে পুকুরধারে বাড়িটা দেখছ, ওইটাই থানা। তুমি সিধে চলে যাও। আমি গেলেই আমাকে ধরে রাখবে। আমি এইখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। বড়বাবু আমায় ডেকে এনে অন্ন দিয়েছিলেন, তাঁর ঋণ জন্মে শোধ হবে না। চলি, দিদিমণি !"

এককড়ি পিছন ফিরে এক দৌড় লাগাল।

ইরানি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, এককড়িকে আর ডাকলেও ফেরানো যাবে না।

তারপর সে নিজেই পুকুরের ধার দিয়ে এসে থানার মধ্যে ঢুকল।

ভেতরে দারোগাবাবু বসে আছেন চেয়ারে। টেবিলের উলটো দিকে বসে আর একটি লোক ঝুঁকে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি একবার মুখ ফেরাতেই ইরানি তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল।

এ সেই ট্রেনের অদ্ভুত লোকটি। যে ডাকাতদের জব্দ করে তাদের রিভলভারটা নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিল।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

মা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

নর্থ-পয়েন্ট হাউসিং এস্টেটে এইবারই প্রথম আবাসিকদের ছেলেমেয়েদের স্পোর্টস হচ্ছে। আবাসিকদের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠান হবে।

শীতের সকাল। নানারঙের গরম পোশাক পরে এস্টেটের বাসিন্দারা উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাট-ঘেরা লম্বাটে মাঠটার চারদিকে ভিড় করেছে। অতি সুন্দরভাবে একের পর এক প্রতিযোগিতা শেষ হচ্ছে। ছেলেদের কমলালেবু আর মেয়েদের জিলিপি দৌড়ের সময় সবাই তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল।

মাইকে এক ভদ্রলোক সুরেলা গলায় প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করছিলেন। এক-একটি বিষয় শেষ হওয়ার পরেই বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হচ্ছিল। ভারী ও লম্বাটে চেহারার আবাসিক সমিতির সভাপতি নিজের হাতে তাদের গলায় মেডেল পরিয়ে দিচ্ছিলেন।

এবার এগারো থেকে চোদ্দ বছর ছেলেদের একশো মিটার দৌড়। স্টার্টার বাঁশি বাজানোমাত্র প্রতিযোগীরা ছুটতে শুরু করল।

একটি কালো স্বাস্থ্যবান কিশোর বিদ্যুদ্বেগে ছুটে প্রথম হল। দৌড় শেষ করে ছেলেটি এতই হাঁফাচ্ছিল যে, যে ভদ্রলোক 'প্রথম' ধরছিলেন, তিনি রেজাল্টের টেবিলে ওকে ধরে আনতে পারছিলেন না।

কিন্তু, একটু পরেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, ছেলেটি নাকি ফ্ল্যাটবাসীদের কারও ছেলে নয়, মিসেস মিত্রের বাড়িতে কাজ করে।

কর্মকর্তারা মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। একজন জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি হিটে উঠল কী করে?"

যিনি প্রতিযোগীদের নাম নিয়েছিলেন, তিনি বললেন, "ও বলল, আমার নাম সুবল, আমি টুকে নিলাম। আমি কি আর ওর মুখের দিকে তাকিয়েছি? তাকালে কি ওর নাম নিতুম!"

অসফল প্রতিযোগীদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবরা বলতে লাগলেন: চাকরবাকরের সঙ্গে কি আমাদের ছেলেরা দৌড়ে পারে? ওদের শক্তি হচ্ছে অসুরের মতো।

এদিকে ছেলেদের একশো মিটার দৌড়ের ফলাফল ঘোষণা করতে না পারার জন্য পরবর্তী পঞ্চাশ মিটারের দৌড় আরম্ভ করা যাচ্ছিল না।

বাড়ির কাজের লোকেরা হাউসিং এস্টেটের কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারে কি না—এ-সম্পর্কে কর্মকর্তারা সংবিধানের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। প্রতিযোগিতা থমকে থাকায় চারদিকে গুঞ্জন আর ছোট-ছোট জটলা।

মিসেস মিত্রের মেয়ে সুমিতাও অনুষ্ঠান দেখছিল। বাবা বাড়ি নেই। ছুটির দিন, কিন্তু অফিসের একটা জরুরি কাজে বেরুতে হয়েছে।

সে ফ্ল্যাটে গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে এল। মিসেস মিত্র খুব দাম্ভিক বলে পরিচিত। তাঁকে দেখে সবাই চুপ করে গেলেন। উনি কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বিচারকদের টেবিলে

এসে বললেন, "আমি সুবলের মা। ও আমার ছেলে। ওকে পুরস্কার দিতে আপনাদের আপত্তি কোথায়?"

যাঁরা নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা মাথা নিচু করলেন। কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করলেন।

গলায় মেডেল-ঝোলানো সুবলকে এক হাতে, অন্য হাতে সুমিতাকে ধরে মিসেস মিত্র নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম
বেবি সিরিয়্যাল

দুধের সঙ্গে মেশান

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন।

নেস্টাম মিশিয়ে নিন।

এবার খেতে দিন।

NESTLÉ

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

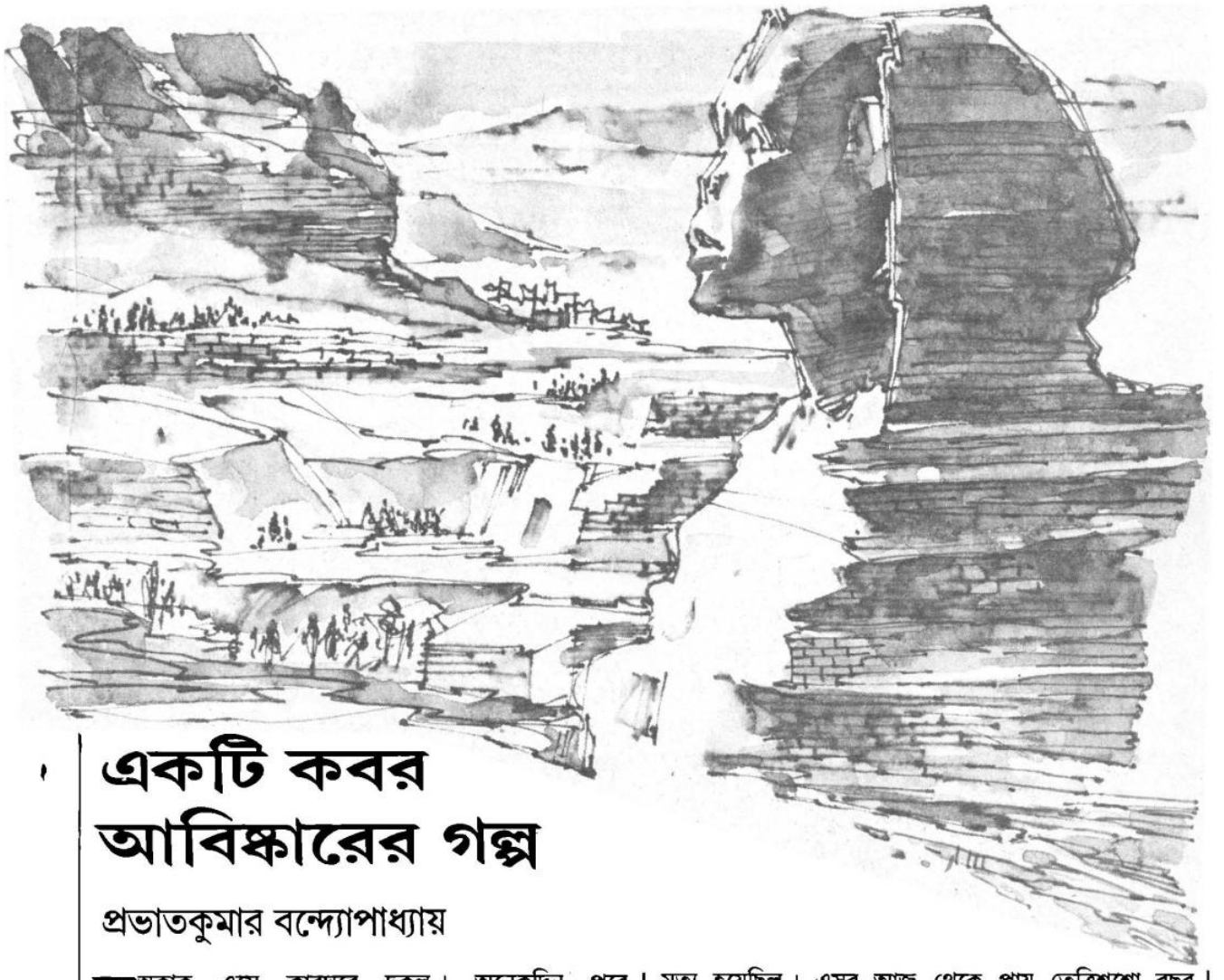

একটি কবর আবিষ্কারের গল্প

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্তুকাকু এসে ক্লাবঘরে ঢুকল। অনেকদিন পরে সন্তুকাকুকে দেখে কিশোর সঙ্ঘের ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে উঠল। সন্তুকাকুর মুখে গল্প শোনার আনন্দ আলাদা। তাই ক্লাবের 'গল্পের আসর' আজ জমজমাট।

সন্তুকাকু বলল, "আজ তোমাদের আসরে একটা দারুণ গল্প বলব। আসলে এটা কোনো বানানো গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা।"

"কী গল্প সন্তুকাকু?" সকলে সমস্বরে বলে উঠল।

"একটা কবর আবিষ্কারের গল্প," সন্তুকাকু বলল। শুনে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে টান-টান হয়ে বসল।

সন্তুকাকু একটু হেসে বলল, "কবরের গল্প বলে কিন্তু ভয় পেয়ো না, এতে ভয়ের কিছু নেই। তবে গল্পটা বেশ রোমাঞ্চকর। এ কবরটা কার জানো? তোমাদেরই মতো একটি কিশোর বালকের।"

আবার সকলে এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

সন্তুকাকু শুরু করল, "এই কিশোর বালকটি কিন্তু ছিল প্রাচীন মিশরের এক রাজা। প্রাচীন মিশরে রাজাকে বলা হত ফারাও। এই কিশোর ফারাওটির নাম ছিল তুতনখামেন। তোমরা হয়তো এ নাম শুনে থাকবে। মাত্র আট-ন বছর বয়সেই সে মিশরের রাজা হয়েছিল, কিন্তু রাজত্ব সে বেশি দিন করতে পারেনি। মাত্র আঠারো কি কুড়ি বছর বয়সেই তার মৃত্যু হয়েছিল। এসব আজ থেকে প্রায় তেত্রিশশো বছর আগেকার কথা।"

শুনে সকলেই বিষণ্ণ হল। কিন্তু ওরা আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠল।

সন্তুকাকু বলে চলল, "তোমরা তো বইয়ে পড়েছ পৃথিবীর কত জায়গায় ভূগর্ভের নীচে কত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছে। এমনিভাবে ভূগর্ভে হরপ্পা ও মাহেঞ্জো-দারোর আবিষ্কারের ফলে আমাদের ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিশর দেশেও এমনি মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভের অনেক নীচে প্রাচীন রাজাদের অনেক কবর আবিষ্কার করা হয়েছে। কিশোর-রাজা তুতনখামেনের কবরও এমনিভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"কিন্তু মিশরের রাজাদের মাটির অত নীচে কবর দেওয়া হত কেন?" মিলি প্রশ্ন করে।

সন্তুকাকু বলল, "মিলি, তুমি সত্যিই খুব বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্ন করেছ। শোনো, এটা বুঝতে গেলে আর একটু কথা তোমাদের জানতে হবে। প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পরেও জীবনের শেষ হয় না। তাই পরলোকেও তাদের সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেইজন্য মৃতদেহের সঙ্গে নানা রত্ন-অলঙ্কারাদি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র

কবরের মধ্যে রেখে দেওয়া হত। বুঝতেই পারছ, এত মূল্যবান সব জিনিস চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকেই। তাই কবরটা তৈরি করা হত ভূগর্ভের অনেক নীচে, যাতে চোর-ডাকাতরা সন্ধান না পায়। কিন্তু তাতেও অবশ্য রেহাই পাওয়া যায়নি। তবে সে-কথা আজ নয়, সুযোগ হলে সে-গল্প আর একদিন বলব।"

একটু চুপ করে থেকে সন্তুকাকু আবার বলল, "আজ আমি তোমাদের তুতনখামেনের কবর আবিষ্কারের গল্পটাই শোনাব। এর আগে প্রাচীন মিশরের আরও অনেক রাজার কবর আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু তুতনখামেনের কবর আবিষ্কার যেমনি আকস্মিক, তেমনি রোমাঞ্চকর।

"এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। প্রাচীন মিশরের রাজধানী থিব্‌সের নাম তোমরা পড়েছ। এই থিব্‌স যেখানে অবস্থিত ছিল তারই কাছাকাছি একটা জায়গায় খননের কাজ চলছে। কাজের তত্ত্বাবধান করছেন দু'জন ইংরেজ। একজনের নাম জর্জ এডওয়ার্ড হারবার্ট। ইনি লর্ড কারনারভন নামেই পরিচিত ছিলেন। অপরজনের নাম হাওয়ার্ড কার্টার। কার্টারসাহেব ছিলেন খুব নামকরা পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীনকালের শিল্পকর্ম, জিনিসপত্র, নানা স্মারকবস্তু পরীক্ষা করে প্রাচীন মানুষের ইতিহাস, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তাঁদেরই বলা হয় পুরাতত্ত্ববিদ। কার্টারসাহেব আবার ছিলেন একজন ঝানু মিশরতত্ত্ববিদও। প্রাচীন মিশরের ব্যাপার-স্যাপার ছিল তাঁর একেবারে নখদর্পণে।

"যাই হোক, খননের কাজ চলছে। আশা-নিরাশার নাগরদোলায় ওঁরা দুলছেন। উত্তেজনায় ভরা প্রতিটি মুহূর্ত। এই বুঝি একটা কিছু শাবলের ঘায়ে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু না, কিছুই নয়। এমনিভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। দেখতে দেখতে একটা যুগই কেটে গেল। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে প্রায় দু-লক্ষ টনের মতো মাটি-পাথর তোলা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাটি খোঁড়াই সার। মিশরের ফারাওদের টিকিটিও তো দেখা গেল না। কিন্তু কার্টারসাহেব দমবার পাত্র নন। প্রাচীন মিশরের এরকম আর একজন ফারাও ষষ্ঠ রামেসিসের কবর মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব কার্টারসাহেবেরই। কাজেই তাঁর নির্দেশে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলতে থাকল।

"নিষ্ঠা, পরিশ্রম, একাগ্রতা কখনও বিফল হয় না। কাজ চলছিল রামেসিসের সমাধিরই পাশে। ১৯২২ সাল। বাতাসে তখন সবেমাত্র একটু শীতের আমেজ দিয়েছে। মজুরদের উদ্যমে তাই খামতি নেই। একটা জায়গায় শাবলের ঘা পড়তেই মনে হল যেন একটা সিঁড়ির ধাপ। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কার্টারসাহেব। দেখে একটু চমকে উঠলেন। কিন্তু না, একজন ফারাওয়ের সমাধির এত কাছে আর একজন ফারাওয়ের সমাধি কি থাকতে পারে? কিন্তু কার্টার শেষ না দেখে ছাড়বেন না। শাবলের ঘা পড়তেই লাগল। কিন্তু এ কী! এ যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যাচ্ছে না! আরও একটা সিঁড়ির ধাপ আগের ধাপটার ঠিক নীচেই। কার্টার পুলকিত, রোমাঞ্চিত। খোঁড়া চলতে লাগল। বেরুল একটার পর একটা, মোট ষোলোটা সিঁড়ির ধাপ। তবে কি কার্টারের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে! অকস্মাৎ কার্টারসাহেব সচকিত। সিঁড়ির ধাপগুলির শেষে মাটির গর্ভে দেখা যাচ্ছে একটি বন্ধ দরজা। কার্টার যেন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছেন না। নেমে পড়লেন ভূগর্ভে। কাছে গিয়ে দেখলেন দরজাটি পাথরের, নীচের দিকটায় কী যেন একটা ছাপ। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখলেন সেটি তুতনখামেনের রাজকীয় সীলমোহরের ছাপ। তোমাদের আগেই বলেছি কার্টারসাহেব ছিলেন একজন ঝানু মিশরতত্ত্ববিদ। কাজেই এই ছাপটি চিনতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুলচুক হয়নি। তিনি তখন আনন্দে আত্মহারা। বুঝতে পারছেন তুতনখামেনের কবরের যুগ-যুগান্তরের আবরণ উন্মোচন হতে চলেছে।

"কাজ যথারীতি চলতেই থাকল। দেখা গেল, ঐ দরজাটির পিছনে ছ-ফুট চওড়া একটি পথ ফুট-তিরিশেক নীচে নেমে গেছে। পথটি বালি, নুড়ি-পাথরে ভর্তি। ওগুলো সরিয়ে এগিয়ে যেতেই পথের শেষে আর একটা দরজা। এটিও বন্ধ, ওপরে প্লাস্টারের আচ্ছাদন। একটু পরিষ্কার করতেই দেখা গেল সেখানেও তুতনখামেনের সীলমোহরের ছাপ। কার্টার দরজাটির এক জায়গায় একটু গর্ত করলেন। গর্তে চোখ রেখে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখলেন ওপাশে একটি কক্ষ এবং তার মধ্যে কত রত্নসম্ভার, মূর্তি, আসবাব। গর্তটি আরও বড় করে দুজনেই ঢুকে পড়লেন কক্ষটির মধ্যে। প্রথমেই চোখে পড়ল হাতির দাঁত ও সোনার কারুকার্যমণ্ডিত একটি কাঠের চেয়ার। রাজা সম্ভবত শৈশবে এটি ব্যবহার করতেন। দেখলেন দু-চাকার চারটি রথ, নানা রত্ন খচিত, কারুকার্যময়। কিশোর-রাজা এই রথে চড়ে বেড়াতেন, শিকার করতেন। রাজার বেড়াবার একটা ছড়িও পাওয়া গেল, হাতলটা হাতির দাঁতের তৈরি। পাওয়া গেল সোনামোড়া তিনটি কাঠের কোচ, একটি সুন্দর কাসকেট, যার চারটি ধারই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। এই কাসকেটের মধ্যেই থাকত রাজার পোশাক-পরিচ্ছদ। একটি বাক্সের মধ্যে সাত-আটটি সোনার আংটি। এছাড়া সিন্দুক, টুল প্রভৃতি তো কতই দেখা গেল। কক্ষটির বাইরে দরজার দু-পাশে দুটি দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মূর্তি। কাঠের মূর্তিতে কালো ও সোনালি রঙ করা। দুজনেরই হাতে স্বর্ণদণ্ড, কপালে রাজকীয় সর্প।

"এই কক্ষটির সংলগ্ন আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কক্ষ। এখানে ঢুকেই দুজনের চক্ষুস্থির। ওঁদের চোখের সামনে তুতনখামেনের অপূর্ব রাজ-সিংহাসন। ওঁরা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়েই ভূগর্ভে নেমেছিলেন। সেই আলোয় দেখলেন কাঠের সিংহাসনটি সোনার পাতে মোড়া, সোনা, রুপো ও রঙিন পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। দুপাশে রুপোর মুকুট, গায়ে কয়েকটি দৃপ্তভঙ্গি সিংহের মুখ। সিংহাসনের পিঠ রাখার জায়গায় অপূর্ব খোদাই। তাতে দেখা যাচ্ছে, কিশোর রাজা তুতনখামেন রাজকীয় ভঙ্গিমায় বসে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাশে দাঁড়ানো তার কিশোরী রানির দিকে। রাজা-রানির এমনি আরও অনেক খোদাইচিত্র পাওয়া গেল। কোথাও রাজারানি পরস্পরকে আতরসিক্ত করছেন, কোথাও বা তাঁরা শিকারে মত্ত।

"কার্টার ও হারবার্টের উৎসাহ তখন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ওঁদের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে এক-এক করে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল কিশোর রাজার আরও কয়েকটি মিনেকরা কাঠের মূর্তি,

কারুকার্যখচিত ফুলদানি, অপূর্ব একজোড়া চটিজুতো, মাথার দিকটা হাঁসের মুখের আকৃতিবিশিষ্ট, সোনাবাঁধানো। এ-ছাড়া বিচিত্র সব জমকালো পোশাক-আশাক, পর্দা প্রভৃতি। অনেক কিছুতেই পাওয়া গেল রাজারানির নাম। ইতিহাসের এইসব মূক সাক্ষী পুরাতাত্ত্বিকদের গবেষণায় হয়ে উঠেছে মুখর।

"তোমরা হয়তো ভাবছ কবরের মধ্যে পাওয়া এইসব দামি লোভনীয় জিনিস নয়ছয় হয়ে গিয়েছিল। না, জেনে রাখো, এর একটা জিনিসও বেহাত হয়নি। কার্টারসাহেব নিজে এর প্রতিটি জিনিসের বিস্তারিত তালিকা তৈরি করেছেন আর তালিকায় নামের পাশে পাশে ওগুলির রেখাচিত্র এঁকেছেন। কার্টারের তৈরি এই তালিকা ও রেখাচিত্র এখনও রাখা আছে অক্সফোর্ডে গ্রিফিথ ইনস্টিটিউটে। আর কবরে পাওয়া জিনিসপত্রগুলি সবই রয়েছে কায়রো জাদুঘরে।"

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে সন্তুকাকু একটু থামল।

"থামলে কেন, সন্তুকাকু?" ওদের সোৎসুক প্রশ্ন।

সন্তুকাকু বলল, "না, থামছি না। এইবার দ্বিতীয় পর্ব। জীবনের চরম সাফল্য অপেক্ষা করে রয়েছে কার্টারের জন্যে। খোঁড়াখুঁড়ি এগিয়ে চলেছে। আরও একটি দরজা দেখা গেল। দরজা কেটে গর্ত করতেই কার্টার বিস্ময়ে অভিভূত। ডাকলেন কারনারভনকে। দ্যাখো,দ্যাখো, সোনার মন্দির। অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ চলতে লাগল। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল মন্দিরটি। তুতনখামেনের অতিকায় সমাধিমন্দির। এর চারপাশে চারটি দেবীমূর্তি। দরজা খুলে দেখা গেল একটা নয়, পর-পর চারটি মন্দির, একটির মধ্যে আর একটি, একটির চেয়ে আর একটি ক্রমান্বয়ে ছোট। সাড়ে-তিন হাজার বছর পরেও স্বর্ণময় মন্দিরগুলির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি দেখে ওঁরা বিস্মিত। চতুর্থ মন্দিরটির মধ্যেই রয়েছে তুতনখামেনের শবাধারটি। কার্টারের শরীর উত্তেজনায় অবশ। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্বাক, নিশ্চল। একটু পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার শুরু করলেন পরীক্ষা। দেখলেন, শবাধারটি বেলেপাথরে তৈরি, ঢাকনাটি গোলাপি রঙের গ্র্যানাইট পাথরের। বিশাল শবাধারের মধ্যে তিনটি কফিন— একটির মধ্যে আর একটি। সব শেষেরটিতে রয়েছে তুতনখামেনের মমি। প্রাচীন মিশরের এই রীতিটির কথা তো তোমরা বইতে পড়েছ। মৃতের শরীরের হৃৎপিণ্ড, যকৃত, অন্ত্র প্রভৃতি বার করে ফেলে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহটিকে মমি করে রাখা হত। কিন্তু তুতনখামেনের ক্ষেত্রে দেহের ভেতরের সবকিছু অবিকৃত রেখেই মৃতদেহটিকে মমি করে রাখা হয়েছিল।

"এখন শোনো কফিনটির কথা। এটি নিরেট সোনায় তৈরি এবং এত ভারী যে চারজন লোকে তুলতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। ওজন তিনশো পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দেড়শো কিলোগ্রাম। কফিনের ভেতরে-বাইরে মণিমুক্তো খোদাই করা, নানা মূল্যবান পাথর বসানো। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, কফিনের গায়ের সোনাটুকুরই দাম আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার সোনার দামের হিসেবে ছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ এখনকার টাকার দামে আট লক্ষ টাকা। তাহলে এখনকার সোনার দর ধরলে দামটা কত দাঁড়াবে সেটা তোমাদের বাবা-কাকাদের কাছে জেনে নিও।

"হ্যাঁ, যা বলছিলুম। মমির দেহে অজস্র অলঙ্কার, কোনো

অঙ্গ বাদ নেই। তেরোটি আংটি ও গোটাকুড়ি ব্রেসলেট পাওয়া গিয়েছিল। মমির মাথাটিতে একটি সোনার মুখোশ পরানো। মুখোশটি তুতনখামেনেরই প্রতিকৃতি। সমাধিকক্ষটির মধ্যে আর একটি অনিন্দ্যসুন্দর জিনিস পাওয়া গেছে যার কথা তোমাদের না বলে পারছি না। এটি একখানি হাতপাখা, উটপাখির পালক দিয়ে তৈরি, হাতলটা তৈরি হাতির দাঁত দিয়ে। এতে বোঝা যায় ঐ কিশোর বয়সেই তুতনখামেন কত শৌখিন ও শিল্পরসিক ছিলেন।

"১৯৩০ সালের শেষাশেষি নাগাদ কার্টারসাহেবের কাজ শেষ হয়ে গেল। আগেই তোমাদের বলেছি কবরে পাওয়া ঐশ্বর্যসামগ্রী রাখা আছে কায়রো জাদুঘরে। কেবলমাত্র কিশোর-রাজার মমিটি রয়েছে শবাধারের মধ্যে তার নিজস্ব কফিনে সেই ভূগর্ভেই।

"কার্টারসাহেবের কাজও শেষ হল, আমার গল্পও শেষ হল," সন্তুকাকু উঠে দাঁড়াল। বলল, "এই গল্পে আমি যা-কিছু তোমাদের শোনালুম সে-সমস্ত লেখা আছে কার্টারসাহেবের তিনখণ্ডের বিপুলায়তন বইয়ে ও আরও অনেক পণ্ডিতের লেখা নানা বইয়ে। এসব বই পড়লে এই কবর আবিষ্কারের আরও অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী তোমরা জানতে পারবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কিশোর-রাজা তুতনখামেনের কবর আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার। আমি বলি, যে-কোনো অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর চেয়েও এটি বেশি রোমাঞ্চকর।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টিনটিন

হাহাহা ! গুগুার গপ্পো ফেঁদে আমাকে বোকা বানাবে ? আসলে, কোত্থেকে কথা বলছ বলো তো দেখি ? আর হ্যাঁ, বিমার কী হল ?
সত্যি বিপদে পড়েছি ! ফরাসি আর সুইস পুলিশকে খবর দাও !
হাহাহা ! আবার মিছে কথা ? এর পরে বলবে, মহারানিকে খবর দাও !
পাজি ! উল্লুক ! গণ্ডার ! গাধা ! পুলিশকে খবর দাও ! এক্ষুনি ! তীরে পৌঁছে গেছি ! ওই ক্যালকুলাসকে ওরা একটা গাড়িতে তুলল !···
গাড়ি ছুটছে ! লঞ্চ ফিরে যাচ্ছে !
জয়লন, আমরা এখন হেলিকপ্টারে করে গাড়িটার পিছু নিয়েছি···ঈশ্বরের দোহাই, পুলিশকে জানাও···
F-VRDC
আরে, একী ! সর্বনাশ !
এ যে দেখছি বেতারের ধারাভাষ্য লাগিয়ে দিলে হে !
বিদ্যুতের খুঁটি !
আর-একটু হলেই ধাক্কা লাগত !
জোর বেঁচেছি !
প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার আকাশে উঠলুম
F-VRDC
আরে ক্যাপ্টেন, এখনও ধারাভাষ্য চালিয়ে যাচ্ছ ?
পাজি ! উল্লুক ! যা বলছি, করো ! পুলিশে খবর দাও !
লাভ নেই ক্যাপ্টেন ! যা-ই বলো, ও বিশ্বাস করবে না ! এদিকে পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে ! নামতেই হবে !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

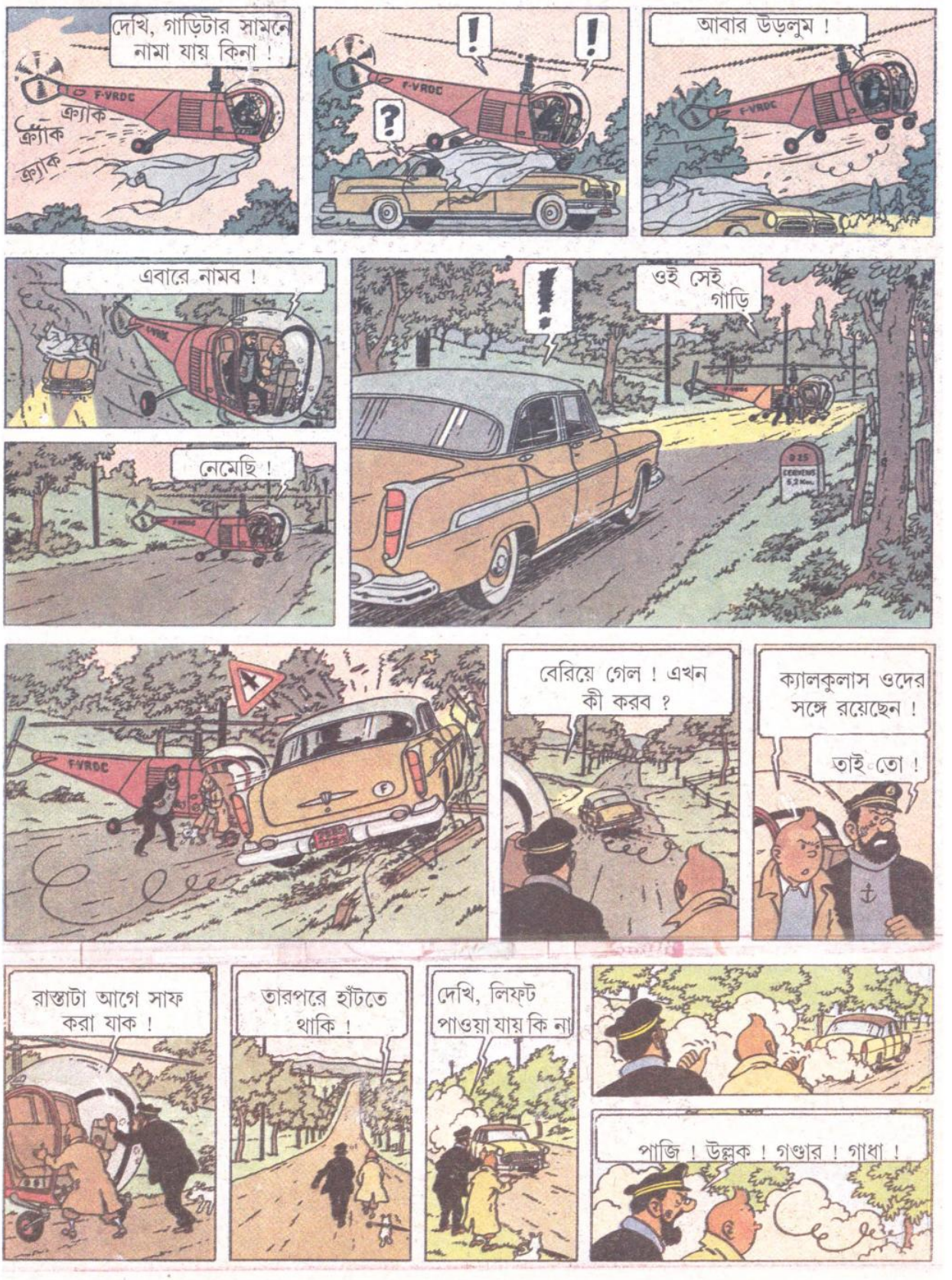

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

মেলবরোর ম্যানেজার জ্যাকসনের সঙ্গে বেতার-বিতর্কে যোগ দিতে চায়নি রয়। মেলচেস্টার রোভার্স আজ স্থানীয় একটি স্কুলে কোচিং দিতে এসেছে...
এইবারে দ্যাখো কীভাবে হেড করতে হয়!
কপালের মাঝামাঝি বল ছোঁয়াবার আগের মুহূর্তে শূন্যে লাফাবে...তারপর...

বাপরে!
এই দ্যাখো!
শাবাশ!

সেইসঙ্গে শুটিং-প্র্যাকটিসও চাই!
আরে...
এ কী!

অ্যাণ্ডি জ্যাকসন! এখানে কী চাও?
বেতার-বিতর্কে যোগ দিলে না কেন, জানতে চাই!

হঠাৎ...
আরে, সঙ্গে ফোটোগ্রাফার! ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে!
বটে! দেখাচ্ছি!

এইভাবে বল শুট করবে!
মারো রয়!
বাবা রে!
ক্যামেরা ছিটকে গেছে!

মুহূর্তে হৈহৈ পড়ে গেল!
কী করে মাঠে ঢুকেছে, জানি না!
ঠিক আছে!
জ্যাকসন, দেখছি সত্যিই একটা ঝগড়া বাধাবে!

উপর্যুপরি কয়েকটি সাংবাদিক-বৈঠকে জ্যাকসন…

হেকলাভিকের কাছে পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারছে না রয় ! আপত্তি সেই জন্যেই !

রয়ের ক্লাবেও ফোন করল জ্যাকসন…

বিতর্কে হেরে যাবার ভয়ে তুমি এলে না !

সে তুমি যা খুশি ভাবতে পারো !

পরে…টেলিভিশনে…

হেকলাভিক তো রোভার্সকে হারিয়েছে ! এবারে আমরাও হারাব !

রয়, তোমার উত্তর দেওয়া উচিত !

উত্তরটা তো খেলার মাঠেই দেওয়া উচিত, তাই না ?

মনে হচ্ছে, মাঠে দারুণ লোক জমবে !

রয় ঠিকই বলেছিল…হাজার-হাজার লোক নদী পেরিয়ে খেলা দেখতে যাচ্ছে…

রোভার্স ! রোভার্স !

মেলবরোকে হারাবই !

FERRY

খেলা-শুরুর এক ঘণ্টা আগেই সমস্ত টিকিট শেষ !

রোভার্সকে হারাব !

জ্যাকসন ঠিক বলেছে !

হাহাহাহা !

রোভার্সের ড্রেসিং রুমে…

বিতর্কে নামলে ক্ষতি ছিল না !

ঠিক বলেছ ! ওরা ভাবছে যে, আমরা ভয় পেয়েছি !

ঠিক কথা !

রোভার্স মাঠে নামছে…

দুয়ো রোভার্স, দুয়ো !

গো-হার হারাব !

অন্তত তিন গোল দেব !

কী হবে এই খেলায় ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলাম কাদিরের কাণ্ড

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

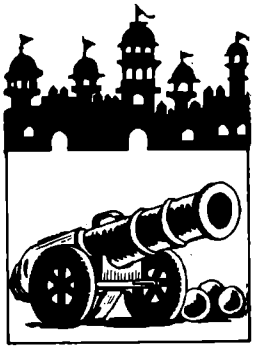

বাদশা ঔরঙ্গজেব প্রথম আলমগির ১৭০৭ সালে দাক্ষিণাত্যে মারা গেলেন। আগেই বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁর স্থান নিতে পারেন, তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন কেউ নেই। বাহান্ন বছর পরে আলি গহর, দ্বিতীয় শাহ আলম, অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন, প্রায় ৪৭ বছর। সাম্রাজ্য বলতে তখন আর বিশেষ কিছু ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি দিল্লি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মির কাশিমের সঙ্গে মিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে তাঁদের বড় রকমের হার হল। শাহ আলম তারপর বহুদিন পর্যন্ত এলাহাবাদে ইংরেজদের আশ্রয়ে থাকতেন। অবশেষে সাত-আট বছর পরে তিনি দিল্লি ফিরে গিয়ে মারাঠাদের আশ্রয়ে থাকেন। শাহ আলমের পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরিণাম তাঁর পক্ষে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সে-কথা বোঝা যায়নি। শাহ আলমের আয়ু দীর্ঘ ছিল, দীর্ঘ আয়ু না হলে তিনি হয়তো অত কষ্ট পেতেন না।

মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন আফগানরা রোহিলখণ্ডে তাঁদের নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের নেতা জবিতা খানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে গোলাম কাদির ক্ষমতায় এলেন। গোলাম কাদিরের ইচ্ছা ছিল তিনি সম্রাটের মির বকশি অর্থাৎ সেনাদলের অধিনায়ক হবেন, সব ক্ষমতা তাঁর হাতে আসবে। তিনি দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং সম্রাট শাহ আলমের দর্শন চাইলেন। তখন পর্যন্ত দিল্লিতে মহাদজি সিন্ধিয়ার কিছু আধিপত্য ছিল, কিন্তু তিনি তখন খুব বিব্রত। গোলাম কাদিরকে বাধা দিতে পারেননি। তিনি বুঝেছিলেন গোলাম কাদির দিল্লিতে এলে মারাঠাদের আর ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু বাদশার নাজির মনজুর আলি গোলাম কাদিরকে নিয়ে আসবার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। তখন পুরো বর্ষাকাল, যমুনার জল স্ফীত হয়েছে। অন্তত কিছুদিনের জন্য গোলাম কাদিরকে বাধা দেওয়া শক্ত হত না। সামান্য কয়েকজন মারাঠা সৈন্য যমুনার পূর্বতীরে শাহদরার কাছে গোলাম কাদিরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে-চেষ্টা সফল হয়নি। গোলাম কাদির যমুনা পার হয়ে দিল্লি এলেন। শাহ আলমের নাজির মনজুর আলির সঙ্গে মারাঠাদের শত্রুতা ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে মারাঠাদের ক্ষমতা ধ্বংস করা যাবে। ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দু-হাজার রোহিলা সৈন্য নিয়ে গোলাম কাদির দিল্লি শহরে ঢুকলেন। বৃদ্ধ শাহ আলমের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি গোলাম কাদিরকে খুব উঁচু পদ দিলেন। সম্রাট নিজে অবশ্য পছন্দ করেননি। তিনি ভেবেছিলেন রোহিলারা এতে খুশি হয়ে দিল্লি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

শাহ আলম যা আশা করেছিলেন তা হয়নি। গোলাম কাদির ভেবেছিলেন যে, তিনি বিনা ঝঞ্ঝাটে সম্রাটের সব ক্ষমতা নিয়ে নেবেন, তাও হয়নি। বেগম সমরু তাঁর গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে সম্রাটকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গোলাম কাদির তখনকার মতো যমুনা পার হয়ে ফিরে গেলেন। বেগম সমরুর বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। এই শান্তি খুব অল্পদিনের। গোলাম কাদির শক্তি সংগ্রহ করে যমুনার পূর্ব দিক থেকে দিল্লির কেল্লার দিকে কামান দাগতে আরম্ভ করলেন। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাহ আলম সিন্ধিয়ার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সিন্ধিয়ার তখন নিজেরই অবস্থা ভাল নয়, কোনো ফল হল না।

দিল্লিতে শাহ আলমের শত্রুর অভাব ছিল না। দিল্লিতে মহম্মদ শাহর বেগম মালিকা-ই-জামানি শাহ আলমের পুরনো শত্রু। তিনি গোলাম কাদিরকে বারো লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। শর্ত হল শাহ আলমের শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। গোলাম কাদিরের যে বন্ধুত্বের মুখোশ এতদিন ছিল সেটা এইবার খসে পড়ল। তিনি খোলাখুলি দিল্লির প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এর আগেও দিল্লি অনেকবার লুঠ করা হয়েছে। গোলাম কাদিরের ধারণা হল যে, সম্রাটের কাছ থেকে তিনি যত টাকা আদায় করতে পারবেন ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে না। ১৭৮৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথমে দিল্লি শহর গোলাম কাদিরের হাতে চলে এল। শাহ আলমের বাদশাহি তখনকার মতো শেষ। আহমেদ শাহর পুত্র কেদার বখতের পুত্রকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল। শাহ আলম এবং তাঁর ছেলেরা বন্দী হলেন। ততক্ষণে দিল্লি শহরে রোহিলা সৈন্যদের লুঠপাট আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গোলাম কাদিরের অর্থলোভের সীমা ছিল না। তাঁর তাগাদায় উত্যক্ত হয়ে শাহ আলম বারবার বলতে লাগলেন যে, তাঁর যা কিছু সম্পদ ছিল সে সবই তিনি দিয়েছেন। "টাকা কি আমি পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ?" এই কথায় গোলাম কাদিরের রাগ আরও বেড়ে গেল। গোলাম কাদির বললেন, "দরকার হলে তোমার পেট চিরে দেখব সত্যি টাকা লুকনো আছে কি না।" তারপর গোলাম কাদিরের হুকুমে শাহ আলমের চোখ অন্ধ করে দেওয়া হল। তখনও শেষ হয়নি। গোলাম কাদিরের আদেশে একজন চিত্রকর এসে একটি ছবি আঁকল। শাহ আলম চিত হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর বুকের উপর বসে গোলাম কাদির ছুরি দিয়ে তাঁর চোখ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বার করে নিচ্ছে।

কয়েকদিন শাহ আলমকে ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হল, একফোঁটা জলও তিনি পেলেন না। বাদশাহের অন্দরমহল লুঠ করা হল। এর আগেও দিল্লিতে লুটপাট হয়েছে। কিন্তু তখনও অন্দরমহল লুট করার জন্য কেউ হাত

বাড়ায়নি। অত্যাচারের যে-সব গল্প লোকের মুখে শোনা যাচ্ছিল, তাই শুনে একজন বেগম ভয়েই মারা গেলেন। হারেমে বেগমদের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না। সব শেষ হলে নাজির মনজুর আলির পালা। গোলাম কাদির তাকে বললেন, "কেল্লার দাসদাসীরাও জানে কোথায় ধনসম্পত্তি লুকনো আছে, তোমার তো আরও বেশি জানা উচিত।" গোলাম কাদিরের লোকেরা মনজুর আলিকে আচ্ছা করে প্রহার করল, তার বাড়ি লুট করা হল। মনজুর আলির বাড়িতে পাওয়া গেল চল্লিশ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার মোহর, তাছাড়া সোনা-রুপোর বাসনপত্র। গোলাম কাদিরের মনে হল এগুলো তেমন বেশি কিছু নয়। আরও অনেক পাওয়া যেতে পারত।

গোলাম কাদিরেরও দিন ঘনিয়ে এসেছিল। মহাদজি সিন্ধিয়া অবশেষে তাঁর সেনাপতি রানা খানের অধীনে বড় একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন দিল্লি অধিকার করতে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মারাঠা সৈন্যরা দিল্লি এসে পৌঁছল। গোলাম কাদির ভাবলেন, এইবার দিল্লি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি পালিয়ে গেলেন। মারাঠারা আবার দিল্লির কর্তা হল।

সম্রাটের পরিবারের তখন এমন অবস্থা যে, অনেকদিন কারও খাওয়া হয়নি। মারাঠারা তাদের রান্নাকরা খাবার পাঠাতে লাগল। ইতিমধ্যে গোলাম কাদিরের সর্বনাশ আরম্ভ হয়েছে। যে-সব সম্পদ দিল্লি লুট করে তিনি জমা করেছিলেন, তার একটা বড় অংশ রাস্তায় লুট হয়ে গিয়েছে। মারাঠা সৈন্যদের হাতে পড়ে গোলাম কাদিরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আক্রমণের সময় গোলাম কাদির লুকিয়ে ছিলেন। অবশেষে একটি পা জখম হয়ে গেল। সেই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গোলাম কাদির পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি ভাবলেন নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। গোলাম কাদিরকে দেখে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হয়েছিল। কাছেই একজন মারাঠি সেনাপতির শিবির পড়েছিল। তাঁকে খবর পাঠানো হল। কয়েকজন সৈন্য এসে গোলাম কাদিরকে বন্দী করে নিয়ে গেল। প্রথমে তাঁকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে দিল্লির পথে তাঁকে পিটিয়ে মারা হল। গোলাম কাদিরের চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেমন শাহ আলমকে করা হয়েছিল। কথা ছিল তাঁর মৃতদেহ দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। সম্ভব হল না।

সেই সময়কার একজন লেখক বলেছেন, পথে তাঁর মৃতদেহ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। একটি কালো কুকুর, দেখতে অদ্ভুত, তার দু' চোখের চারদিকে সাদা দাগ। কুকুরটি দু'দিন সেই মৃতদেহকে পাহারা দিল। গোলাম কাদিরের মৃতদেহ থেকে যে রক্ত পড়ত, কুকুরটা তা চেটে খেত। দু'দিন পরে দেখা গেল গোলাম কাদিরের মৃতদেহ অদৃশ্য হয়েছে, কুকুরটিও নেই। কেউ কেউ বিশ্বাস করত, কুকুরটি আসলে নরক থেকে এসেছিল গোলাম কাদিরকে যথাস্থানে নিয়ে যেতে।

এই গল্পে একটু ফাঁক আছে। দু'দিন ধরে মৃতদেহ থেকে কি রক্ত পড়তে পারে ? সে-কথা অবশ্য এখন তুলে লাভ নেই।

ছবি [illegible]

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে পুরনো স্কুলের নাম মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল। আর কয়েকদিন পরেই এই স্কুলের বয়েস দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে এবং বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজা তেজশচন্দ্র মহতাব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ১৮৩৪ সালের ১৪ নভেম্বর এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় নাম ছিল মেদিনীপুর জিলা স্কুল, ১৮৭৮ সালে নাম পালটে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল রাখা হয়। ১৮৩৪ সালে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন। ছাত্রদের মাইনে ছিল মাসিক চার আনা, মানে এখনকার পঁচিশ পয়সা। প্রথম প্রধানশিক্ষক ছিলেন হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল জেলার পুরনো এবং নামী স্কুলই শুধু নয়, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও এই স্কুলের অবদান অবিস্মরণীয়। জাতীয় আন্দোলনের মন্ত্রগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এই স্কুলের চতুর্থ প্রধানশিক্ষক (১৮৫১—১৮৬৬)। এই স্কুলের চারুকলার শিক্ষক ছিলেন অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র কানুনগো। শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯২-৯৮) এবং শহীদ ক্ষুদিরাম বসু (১৯০৪-১৯০৬) এই মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় মন্ত্রের উদগাতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৪৯) এবং তাঁর দুই অগ্রজ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৪২) ও 'পালামৌ' গ্রন্থের লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৪৯) এই স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা সেই আন্দোলনে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের

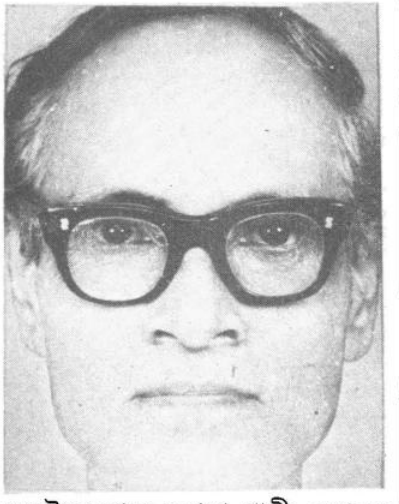

সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ জননায়ক মেদিনীপুর শহরে এসেছিলেন। স্কুলসংলগ্ন মাঠে এক বিশাল সমাবেশে তাঁরা বক্তৃতা করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র, কাজি নজরুল ইসলামও এখানে এসেছিলেন এবং স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

এই বিশিষ্ট স্কুলটির অসংখ্য কৃতী ছাত্র নানাভাবে দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাংলার বীরেন্দ্রনাথ দে, শিল্পী মুকুল দে, স্যার আবদুল্লা সোহারাওয়ার্দি, শিক্ষাব্রতী নীলকণ্ঠ মজুমদার, সূর্যকুমার অগস্তি, আবদার রহিম, সাতকড়িপতি রায় এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১২০০। প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় প্রায় ১০০ জন। পাশের হার ৯০/৯৫। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১১৬ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২৫ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ৫৬ জন। তৃতীয় বিভাগ ২৬ জন। 'স্টার' পেয়েছে ৩ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১২৮ জন। প্রথম বিভাগ ৩০ জন। স্টার পেয়েছে ৮ জন। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরই থাকে। এই স্কুলের ছাত্ররা একাধিকবার স্ট্যাণ্ড করেছে।

স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীহরিপদ মণ্ডল বাংলা এবং ইংরেজির এম· এ·। তাঁর প্রধানশিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ২৬ বছরের। তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধানশিক্ষকতা করছেন ১৮ বছর। তিনি একজন সুলেখক, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং রাজনারায়ণ বসুর জীবন ও দর্শন বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। *কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল করা যাবে*, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে আসতে হবে, ফাঁকি দেওয়া চলবে না। হোমটাস্ক নিয়মিত করতে হবে এবং শিক্ষকদের দেখিয়ে সংশোধন করে নিতে হবে। টেস্টপেপার দেখে প্রশ্ন-উত্তর তৈরি করতে হবে। ভাষার ভুল এবং বানান ভুল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। হাতের লেখা হবে সুন্দর এবং লেখার গতিও বাড়াতে হবে—যাতে সব প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া যায়। পাঠ্যবই তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবেই, সেই সঙ্গে সহায়কবইও ভাল করে পড়তে হবে।"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমণ্ডল জানালেন, "বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে পাঠগ্রহণ করতে হবে। বানানভুল করা চলবে না। নিয়মিত গ্রামার পড়তে হবে, ট্রানস্লেশন করতে হবে। ইংরেজিতে স্বাধীনভাবে, মানে কারুর সাহায্য না নিয়ে, লেখার অভ্যাস করতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো ভুল হবে, কিন্তু তাতে লজ্জার কিছু নেই। স্কুলের মাস্টারমশাই বা অন্য কাউকে দেখিয়ে ভুল শুধরে নিতে হবে। আর নোটবই যে পড়ুয়াদের কী ক্ষতি করে তা বলবার নয়। এই ক্ষতিকারক নোটবই থেকে সাহায্য না-নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মাধ্যমিকই হোক, আর উচ্চ

মাধ্যমিকই হোক, প্রশ্নাবলী নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। নানা ধরনের ইংরেজি বই এবং পত্রিকা পড়াও দরকার।

"বাংলা বিষয়টিকে অনেকেই মনে করে জলের মতো সোজা, বেশি পড়বার দরকার নেই। ধারণাটা একেবারেই ভুল। ভাল বাংলা লেখা এবং ভাল বাংলা বলা রীতিমত চর্চার ব্যাপার, সাধনার ব্যাপার। পাঠ্যপুস্তক তন্ন তন্ন করে পড়তে হবে। সঙ্গে সহায়কবইও। অভিধান এবং পত্রপত্রিকার সঙ্গেও সংযোগ রাখা দরকার—এর ফলে ভাষা এবং রচনাশৈলীর উৎকর্ষ বাড়বে, শব্দের ভাণ্ডার মজবুত হবে। আর হ্যাঁ, হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং নয়, সুন্দর এবং সুছাঁদ হতে হবে। আর লেখায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ চলবে না।"

অঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "অঙ্ক খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভাল করে বুঝতে হবে এবং নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। পাটীগণিত এবং বীজগণিতের অঙ্ক প্রতিদিন অন্তত দশটা করে করতে হবে। অনেকে জ্যামিতি মুখস্থ করে, এটা মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। জ্যামিতি মুখস্থ করার ব্যাপার নয়, অনুশীলনের ব্যাপার।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক শ্রীমণ্ডল জানালেন, "বিজ্ঞান বিষয়টিও মুখস্থ করার নয়। এই বিষয়টিকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে পড়তে হবে, বিজ্ঞানশিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও নেওয়া দরকার। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বাড়াতে হবে। ছবি আঁকার অভ্যাস করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর হবে 'টু দা পয়েন্ট', কোনো অস্পষ্ট ও মনগড়া উত্তর লেখা চলবে না। বিজ্ঞানকে অনেকেই খটোমটো বিষয় বলে মনে করে, কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে বিজ্ঞান বিষয়টি কত চমৎকার।"

ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "ইতিহাসকে অনেকেই 'মৃত' বিষয় মনে করে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইতিহাস রীতিমত 'জীবন্ত' বিষয়। একটু সময় দিলে ইতিহাসে খুব ভাল নম্বর ওঠে। ইতিহাসের স্থান, কাল, চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, সে জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজস্ব চার্ট তৈরি করে নিলে খুব কাজ দেবে।

"ভূগোলও মুখস্থের বিষয় নয়, জেনে এবং বুঝে লেখার বিষয়। কিন্তু সে জানা ধোঁয়াটে হলে চলবে না, যেটুকু বুঝলাম যেটুকু জানলাম তা পরিষ্কার হতে হবে। ম্যাপের ব্যবহার এবং ম্যাপ অঙ্কন ভালভাবে শিখতে হবে। ভূগোলের উত্তর লিখতে হবে যথাসম্ভব সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে।"

কর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রধানশিক্ষক শ্রীমণ্ডলের অভিমত : "কর্মশিক্ষা বিষয়টি ভাল। ছাত্রছাত্রীরা যেন এই বিষয়টিকে শস্তায় নম্বর তোলার বিষয় না মনে করে। ক্লাসের বাইরে বাড়িতেও এই বিষয়টির প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া দরকার।"

'আনন্দমেলা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, "ছোটদের জন্য এরকম চিত্তাকর্ষক পত্রিকা আর দ্বিতীয় নেই। আমরা স্কুলে ছেলেমেয়েদের যা দিতে পারি না, আনন্দমেলা সেই অভাব অনায়াসেই পুষিয়ে দেয়। এই পরিচ্ছন্ন উন্নত মানের পত্রিকাটি থেকে আমি যা পাই, তা বড় কম নয়।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে নীলেন্দু ঘোষ। সে ফাইভ থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে নীলেন্দু পেয়েছিল ৭৫৭। নীলেন্দুর বাবা শ্রীনিত্যগোপাল ঘোষ কলকাতায় সরকারি চাকরি করেন। মা অণিমা ঘোষ স্থানীয় একটি গার্লস হাইস্কুলে পড়ান।

নীলেন্দু সারাদিনে অন্তত আট ঘণ্টা পড়াশোনা করে। ছুটির দিনে আর-একটু বেশি সময় দেয়। তার মা-বাবা তাকে খুব সাহায্য করেন। মা ইংরেজি দেখিয়ে দেন। পড়াশোনার ব্যাপারে সহপাঠী তাপস ভৌমিক, উদয়ন ভট্টাচার্য, প্রদীপ্ত মাইতি, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার রীতিমত প্রতদ্বন্দ্বিতা হয়।

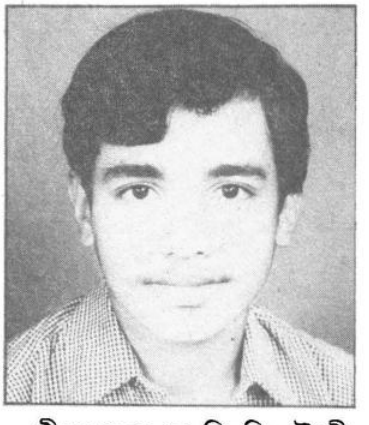

নীলেন্দু বাংলায় বিভূতি চৌধুরী, পি· আচার্য ও জগদীশ ঘোষের বই পড়ে। ইংরেজিতে এ· সি· সেন, পি· কে· দে-সরকার, পি· মাহাতোর বই। অঙ্ক : কেশব নাগ, মনোমোহন রায়চৌধুরী, মৃদুল সেন ও কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলি। ভৌত বিজ্ঞান : সুখেন্দু মাইতি, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ফাইভ স্কলার্স। ইতিহাস : কিরণ চৌধুরী, নিমাইসাধন বসু এবং প্রভাতাংশু মাইতি। ভূগোল : বসু-ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ রায়। অতিরিক্ত গণিত : কেশব নাগ এবং এ· মাইতি।

ফুটবলে তেমন উৎসাহ নেই নীলেন্দুর, কিন্তু ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। প্রিয় খেলোয়াড় কপিলদেব। 'আনন্দমেলা' থেকে খেলার লেখা এবং রঙিন ছবি কেটে জমানো তার অন্যতম প্রিয় খেলা।

গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে নীলেন্দু। বিভিন্ন পত্রিকাও পড়ে। তার প্রিয় কথাসাহিত্যিক মাত্র দুজন। একজন সত্যজিৎ রায়, অন্যজন কোনান ডয়েল। রবীন্দ্রসংগীত এবং পাশ্চাত্ত্য সংগীত শুনতে তার খুব ভাল লাগে।

নীলেন্দু ভবিষ্যতে একজন নামী ইলেকট্রনিক্স্ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আনন্দমেলা নীলেন্দু নিয়মিত পড়ে। ভাল লাগে কমিকস্ আর খেলার লেখা। আনন্দমেলায় সম্রাট রায় আর মণীশ মৌলিকের লেখার কোনো 'জবাব নেই'।

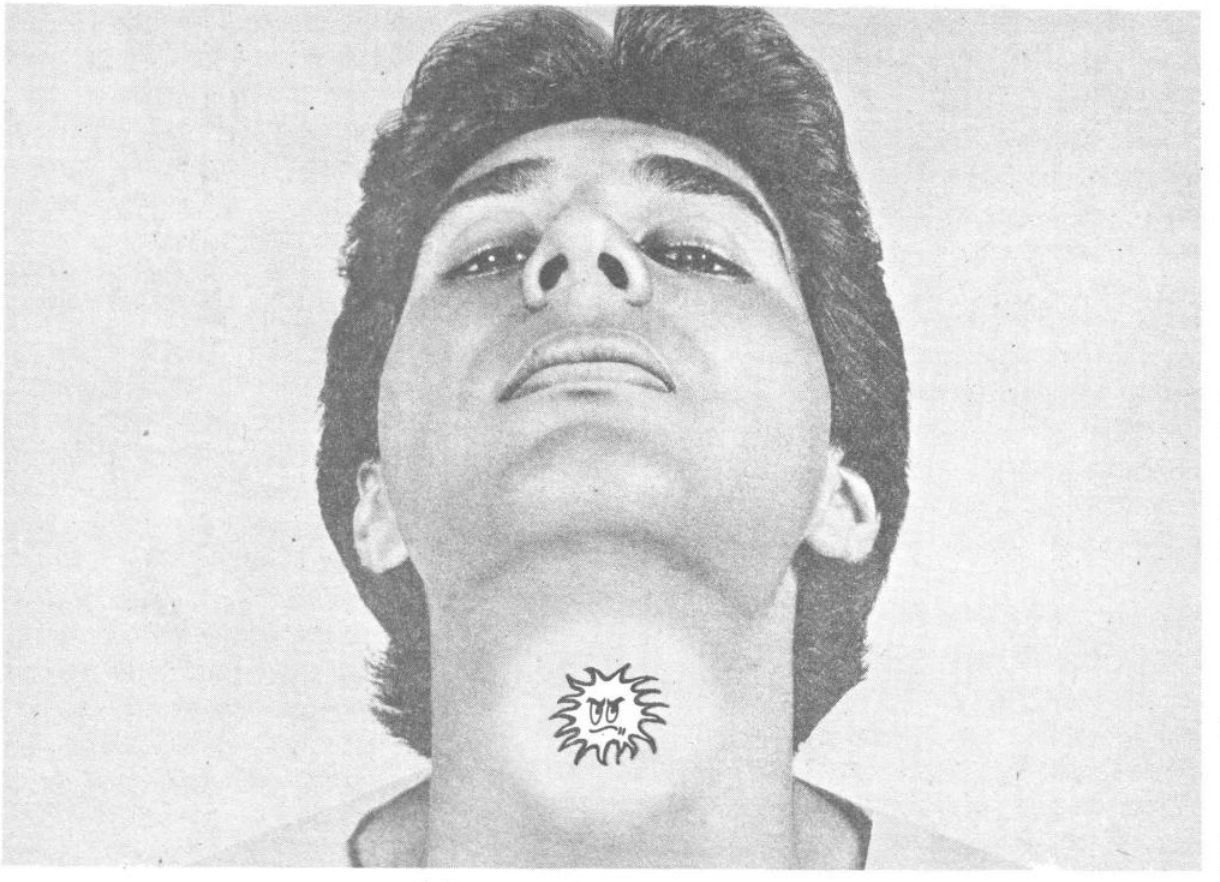

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন...

'খিচখিচ' কি ?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন 'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিক্সের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।
তার জন্য যখনই গলায় 'খিচখিচ' আসবে, ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

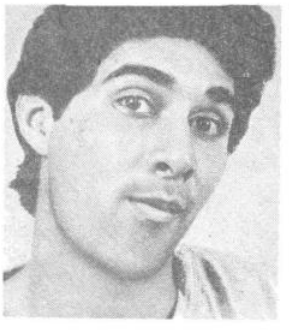

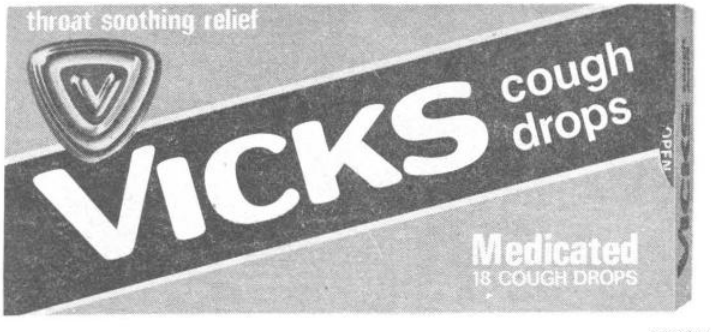

OBM/1829 BEN

ধাঁধা

বেশির ভাগ বাড়িতেই দেখি পুজোর আগে বাড়ি-ঘর-দোর পরিষ্কার-পর্ব শুরু হয়ে যায়, রঙ কিংবা চুনকামের মিস্ত্রি এসে যায় কখনো-বা, বাহারি পর্দা ঝোলে, ঘরের আসবাবপত্র জায়গা বদল করে।

কিন্তু আমাদের উল্টোদিকের বাড়িটায় দেখছি উল্টোরকম কাণ্ড। পুজো শেষ হয়ে গেল, দেওয়ালি-ভাইফোঁটার পাট চুকল, আর এখন কিনা মিস্ত্রি লেগেছে বাড়িতে। ঘরদোর রঙ হচ্ছে।

আমি সেদিন ছোট্কার সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর, এ নিয়ে কথা বলছিলাম। খানিক বাদে দেখি ছোট্কার মাথায় একটা ধাঁধা খেলে গেছে। হ্যাঁ, বাড়ি রঙ-করা নিয়েই ধাঁধাটা। এটা শুনতে সহজ, উত্তরও বোধহয় তেমন শক্ত কিছু নয়। আমি অবশ্য জানি না এখনো, আমার উত্তর মিলবে কি না। তার আগে তোমরা বরং চেষ্টা করে দেখো, কী উত্তর হয়। তারপর মেলাব।

প্রথম ধাঁধা ॥ মনে করা যাক, দুটো ঘর রঙ হবে। একটা

ছোট ঘর, একটা বড় ঘর। বড় ঘরটা ছোট ঘরটার তুলনায় দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ, প্রস্থে দ্বিগুণ, উচ্চতায় দ্বিগুণ।

এখন, ছোট ঘরটার দেয়াল রঙ করতে যদি তিন দিন সময় লাগে একজন লোকের, তাহলে, সেই একই গতিতে কাজ করলে, বড় ঘরটার দেয়াল রঙ করতে কতদিন লাগবে সেই লোকটির ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ তিন দিন আগে ছিল শুক্রবারের আগের বার। খুব তাড়াতাড়ি বলতে পারো, পরশু দিন কী বার হবে ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্টা ঠিক ?

আটে-আটে পনেরো হয়, অথবা আটের সঙ্গে আট যোগ করলে পনেরো হয় ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে গেলে ১ মাইল যেতেই ২ মিনিট লেগে যাবে, সেক্ষেত্রে ট্রেন ফেল করছেনই ফেলুচরণবাবু। (২) তিনটে হাঁস হলেই হবে। (৩) ৯টা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
৬			■	৭		
	■	৮	৯		■	
■	১০	■		■	১১	■
১২		■		■	১৩	১৪
	■	১৫			■	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) শূন্যস্থান পূরণ করো : 'দাসত্ব— বলো কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায় !' (৩) কোন্ ফুল হাঁটার জন্যে তৈরি হয়েই আছে ? (৫) গাড়ি। (৬) হুঁশ। (৭) একটি দুমুখো নাম। (৮) মহাকাশযানকে শূন্যে তোলে। (১২) ছাত্রজীবনে কেউ-কেউ পায়, কর্মজীবনে সবাই নেয়। (১৩) শূন্যস্থান পূরণ করো: — দেখেছ ফাঁদ দেখনি। (১৫) এ-বছরের শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় ফুটবলার।

উপর-নীচ : (১) পানিফল। (২) জাহাজের খালাসি। (৩) রেগে গেলে কেমন করে তাকাও ? (৪) ভেলভেট। (৯) বাহাদুরি। (১০) বাঘছাল। (১১) হালকা। (১২) নেকড়ে বাঘ। (১৪) কাঠপোকা।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ব	শি	ষ্ঠ	■	বি	পা	শা
■	বা	■	■	■	দ	■
জা	জি	ম	■	ব	প	ন
হু	■	শা	র্দূ	ল	■	মু
বী	জ	ন	■	দ	স্তা	না
■	স্নু	■	■	■	ব	■
হ	ক	রে	র	ম	ক	বা

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য শুধু নীচের ছবিটার মতো একটা ছবি তুমি আগে-ভাগে এঁকে রাখবে তোমার খাতায়।

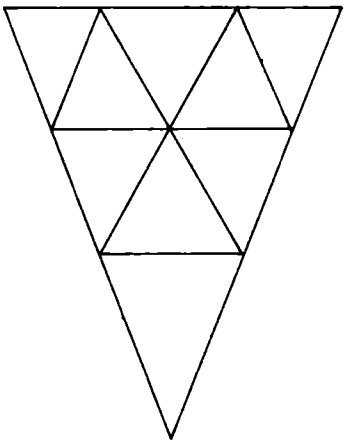

ব্যস, খেলা তৈরি । কী খেলা বলো তো ?

খুব সহজ, খুব মজার খেলা। ব্যাপারটা হল, পেন্সিলে বা কলমে খাতার ওপর এমন একটা ছবি আঁকতে হবে এক টানে, কাগজ থেকে কলম-পেন্সিল তোলা চলবে না, এক দাগের ওপর দিয়ে দুবার যাওয়া চলবে না, তবে হ্যাঁ, এক দাগের ওপর দিয়ে একবার মাত্র ছুঁয়ে মানে দাগটাকে মাত্র একটা বিন্দুতে স্পর্শ করে—নিশ্চয়ই যাওয়া চলবে।

আর কী। এবার লেগে যাও ছবিটা আঁকতে। তুমি নিশ্চিত পেরে যাবে, বন্ধুরা দু-একজনও এটা হয়তো করে ফেলবে, তাতে ক্ষতি নেই। মজাটা ঠিকই থাকবে। নীচের সমাধানটার সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে নিতে পারো—

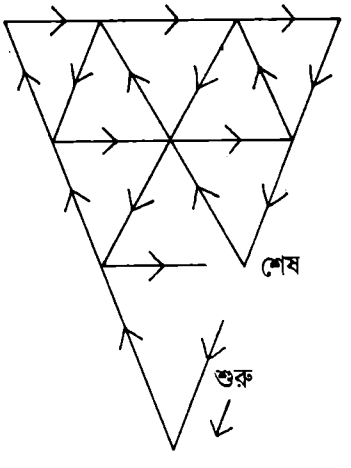

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ আমার জীবনটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ঝকঝকে করে তুলতে চাই, কোনো উপায় বাতলে দিতে পারেন ?

উঃ খানিকটা বেকিং পাউডার খেয়ে জীবনটাকে ফাঁপিয়ে তারপর ডেটারজেন্ট পাউডার দিয়ে মেজে নিন।

প্রঃ আপনি কলম খুঁজছেন, ওটা তো আপনার হাতেই ধরা আছে ?

উঃ সে তো আমি নিজেই জানি, কিন্তু কোন্ হাতে সেটাই তো মনে করতে পারছি না।

প্রঃ বৃষ্টিতে মাথা ভেজাচ্ছ, ছাতাটা খুলছ না কেন ?

উঃ মাথাটা ৫৫ বছরের পুরনো, ছাতাটা যে কালই কিনলাম।

সুসেন

হাসিখুশি

"শুনেছ,বাঘের দুধ খেয়ে একটা বাচ্চার নাকি বাঘের মতো চেহারা হয়েছে ?"

"তাই নাকি ? কার বাচ্চা ?"

"কেন, বাঘেরই বাচ্চা।"

আসামি-পক্ষের উকিল বিচারককে বোঝালেন, আসামি চুরি করেনি। করেছে ওর ডান হাত। হাতের জন্য আসামির শাস্তি হওয়াটা অন্যায়।

বিচারক বললেন, "ঠিক আছে, ওর ডান হাতের চার বছর কারাদণ্ড হল।"

রায় শোনামাত্র আসামি তার কাঠের হাতটি খুলে রেখে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল।

"আচ্ছা দাদু, আমি যদি বাবার শেফার্স কলমটা চুরি করি, তাহলে কী হবে ?"

"পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"তখন তোমাকে ওখান থেকে ওই কলমটায় চিঠি লিখব। কেমন ?"

উকিল : আসামি আপনাকে কী কী গালাগাল দিয়েছিলেন ?

সাক্ষী : স্যার, ভদ্রলোকের সামনে তা বলা যাবে না।

উকিল : ঠিক আছে, আপনি তাহলে চুপিচুপি জজসাহেবের কানে বলুন।

ছবি : প্রহিভূষণ মালিক

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রাজামশাই

তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ

রাজা কহিলেন ইনিয়ে-বিনিয়ে,
"বলতে পারিস থাকিটা কী নিয়ে ?
সাত রানি, সব ক'টাই মূর্খ,
বুঝবে আমার দুঃখ-টুঃখ ?
সারাদিন শুধু সেজেছে, কেঁদেছে,
যত আজগুবি গপ্পো ফেঁদেছে ;
ওরা পড়ে কিছু ? বলতে পারবে
নাসিকের ট্রেন ক'টায় ছাড়বে ?
ক'টা গাড়ি যায়, ক'টা জংশন ?
ক'টা ব্রিজ পড়ে ? ওরে, ঢং শোন্,
বলে কিনা, ওই পুঁথির হিসেব
জন্মে করিনি, তবে তাই শেখ্ !
নইলে কী করে মিনিট ঘণ্টা
কাটাবি এখানে ? জন্ম-সনটা
মনে কি পড়ছে ? কোথায় আছিস্ ?
জাদুঘর এটা, রাজ্য হাপিস্ !"

ছবি : দেবাশিস দেব

জ্ঞানবান

কালিদাস ভট্টাচার্য

শিয়ালটা বসে বসে
করছিল গান,
ভালুক বলল এসে,
গানটা থামান ।
মানুষেরা আপনাকে
শিয়ালদা ডাকে,
সেই ডাক শুনলাম
গিয়ে এক ফাঁকে ।
আপনিও শুনবেন
গেলে কলকাতা,
খাঁটি কথা বললুম
বলছি না যা-তা ।
শিয়ালটা বলে, ভাই
আমি সেটা জানি,
মিথ্যে যে বলছ না
আমি খুব মানি ।
মানুষেরা জেনে গেছে
আমি জ্ঞানবান,
'দাদা' বলে তাই তারা
দেয় সম্মান ।

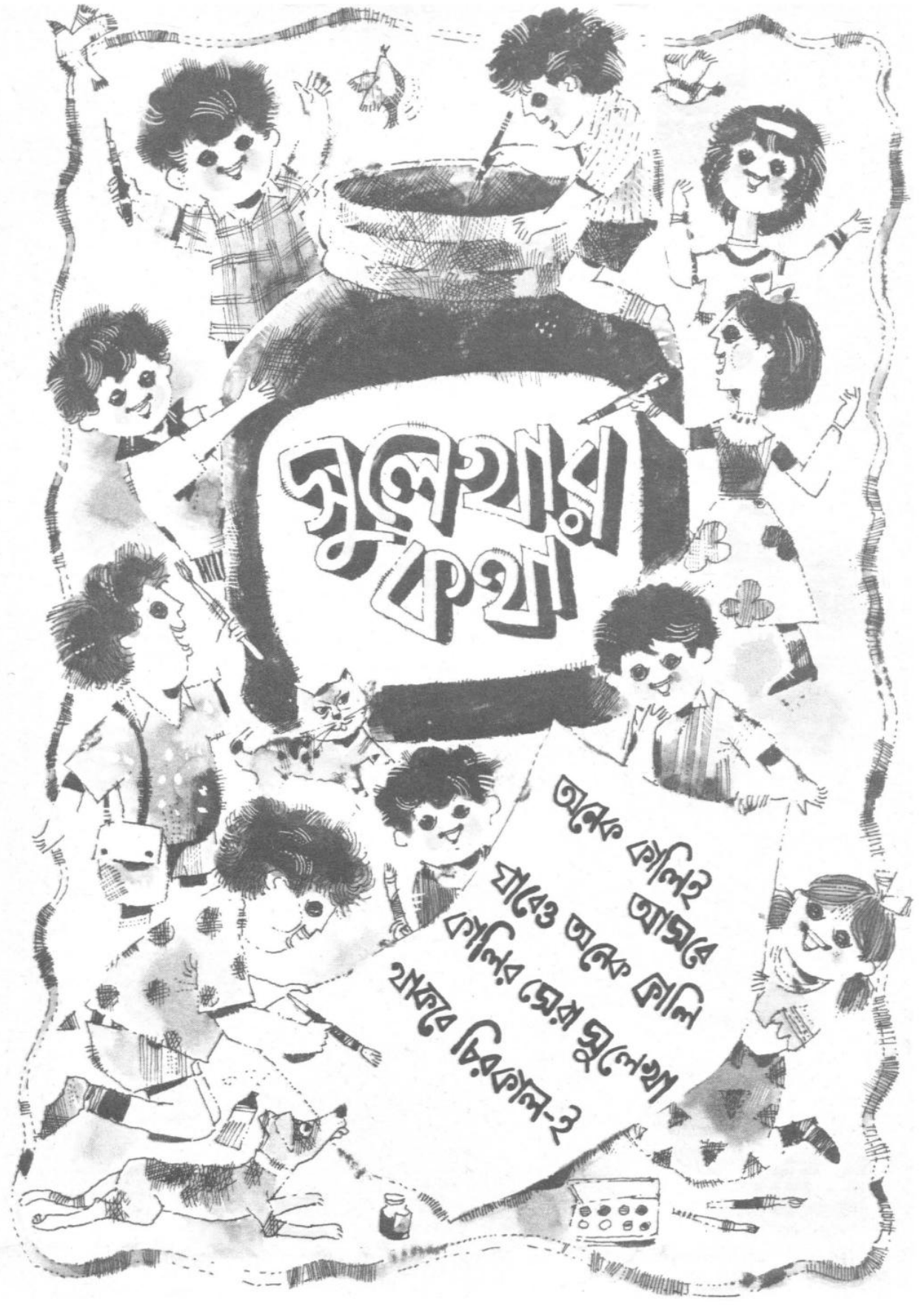

সুলেখার কথা
অনেক কালিই আসবে
যাবেও অনেক কালি
কালির সেরা সুলেখা
থাকবে চিরকাল-ই

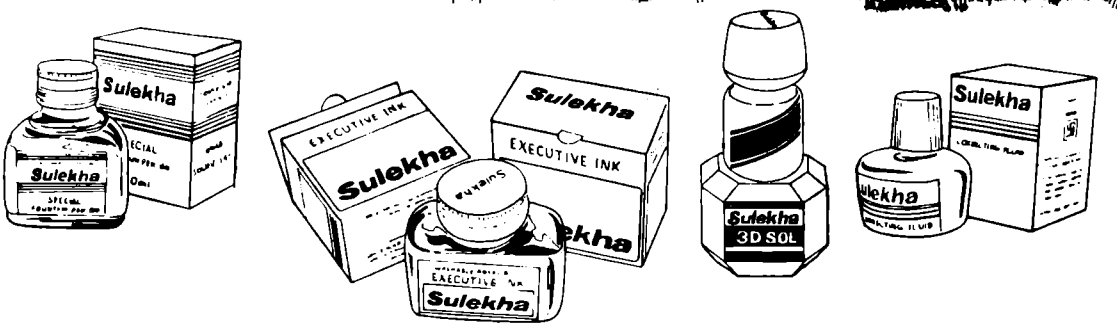

যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কোন কালিতে লেখ তোমার জবাব দিতে এতটুকু দেরি হবে না। কেননা তুমিই শুধু নও। তোমার বাবা মাও তাঁদের ছেলেবেলা থেকে ঐ একই কালি ব্যবহার করে আসছেন। সে কালি সুলেখা কালি। সুলেখা মানে ভাল লেখা। পঞ্চাশ বছর ধরে সুলেখা আমাদের সুন্দর লিখতে সাহায্য করে আসছে। ১৯৩৪ সাল, যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে, তখনই মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে এই স্বদেশী কোম্পানি যাত্রা শুরু করে। তখন ভারতের বাজারে জাঁকিয়ে বসে আছে তাবড় তাবড় বিদেশী কোম্পানি। তাদের চাপে পড়ে কত দিশি কোম্পানিই তো উঠে গেল। কিন্তু সুলেখাকে কেউ কাত করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সুলেখা কালির গুণমান পৃথিবীর যে কোনও সেরা কালির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত।

স্বাধীনতার পরে তো সুলেখার বাড় বাড়ন্ত। আগে ছিল শুধু একটি ফ্যাক্টরি। এখন তিন তিনটে। যাদবপুর, সোদপুর আর ইউ পির গাজিয়াবাদে। ভাবছ, এখানেই শেষ। মোটেই তা নয়। কেনিয়া বলে আফ্রিকা মহাদেশে একটি রাষ্ট্র আছে। সেখানে ফাউন্টেণ পেন এর কালি তৈরির একটি কারখানা চালু করবার জন্য সুলেখাকে ডাকা হয়েছিল। সুলেখা সুন্দরভাবে কাজটি করে এসেছে চুক্তি মতই। সুলেখা যেমন নানা রকমের লেখার কালি বানায় তেমনি অন্য জিনিসও বানায়। কেবল মারকিং ইংক, ইনস্ট্রুমেণ্ট রেকর্ডার ইংক, ডুপ্লিকেটিং ইংক, স্ট্যাম্প প্যাড ইংক—এতো গেল কালির ব্যাপার। এ ছাড়া আছে ফিনাইল, বাড়ির জীবাণু মুক্তকারী সুগন্ধময় সুলেখা থ্রি ডি সল। আর এই কোম্পানি শিগগিরিই কি কি জিনিস বাজারে চালু করতে যাচ্ছে জান ? ড্রইং ইংক, পোস্টার কালার, ওয়াকস ক্রেয়ন, ওয়াটার কালার, অয়েল কালার, এই সব। একটা মজার খবর দিয়ে রাখি এই সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে দেখতে পাবে সুলেখার টম্যাটো সস, জেলি, জ্যাম ইত্যাদি মুখরোচক জিনিস। এই নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। বাজারের অন্য সকলের থেকে সুলেখার জিনিসটা অনেক ভাল করা চাই তো। সেই জন্য। আমার তো মনে হয় শিগগিরি এমন দিন আসছে যেদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি সব জিনিসই পেয়ে যাবে সুলেখার কাছ থেকে। ভাবা যায় একটি বাঙালি কোম্পানি এ্যাতো উন্নতি করেছে। বাঙালির ব্যবসার ইতিহাসে এই গৌরবগাথা 'সুলেখা কালিতে' লেখা হয়ে থাকবে চিরকাল।

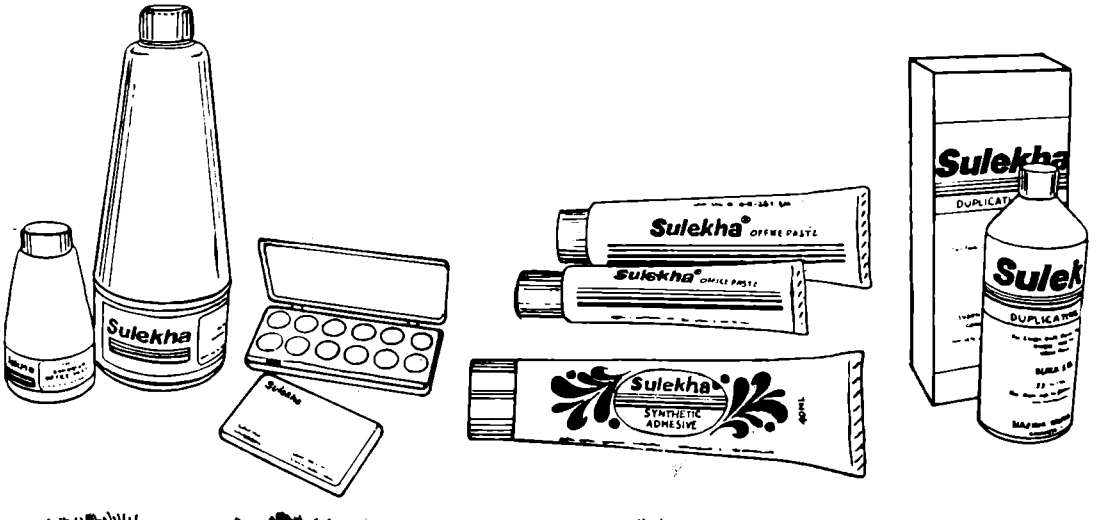

খুকু ডাকে পুসি
পুসি ডাকে ম্যাও
সুলেখা জল রঙে
ছবিটা রাঙাও

সারাদিন তো মিছি মিছি
বকছ আমায় খালি,
হাতের লেখা খারাপ বলে
ধমকেছিলে কালই,
একটা কথা চুপি চুপি
আজকে তোমায় বলি,
ফুলের মতো লেখা হ'বে
চাই সুলেখা কালি।

হাতের লেখা ভাল করবে
খোকন করে পণ
মুখ গুমরে বসে আছে
মন উচাটন।

কলমটাও ভালই আছে
কালিও আছে কত
ওরে কেন হয় না লেখা
কবি দাদুর মতো

পাড়ার পিন্টু বলে তাকে
শোন খোকন ভাই
হাতের লেখা ভাল করতে
সুলেখা কালি চাই।

সুলেখা কালি সুলেখা কালি
মনের কথা তোমায় বলি
তোমার রং বড়ই মধুর
লেখা যেন কবি দাদুর।

শোন সুলেখা আজব কালি—
হাজার খাতায় লিখছি খালি
একজামিনে হচ্ছি পাশ
নেইকো মনে একটু ত্রাস !
দেখচি চেয়ে সব খাতায়
মুক্ত আখর মুক্তি পায়।
এই সুলেখার যাদুর খেল
খাতায় চলে তুফান মেল !
শোন সুলেখা বন্ধু মোর—
বাঁধলি প্রাণে প্রীতির ডোর
খোকাখুকু হাস্য সুখ
পড়াশোনায় নেইকো দুখ।
কলম চালাই এই প্রথম
বন ভোজনে আলুর দম ॥

কালি দিয়ে লিখছি মোরা
শিখছি মোরা অনেক কিছু।
লিখতে গিয়ে নানান বিষয়
কলম ছোটে কালির পিছু।
ভালো কালি কালোকালি
নানান রঙের সেরা কালি,
কলম বলে কোথায় পাই ?
সুলেখা বলে এই যে ভাই।

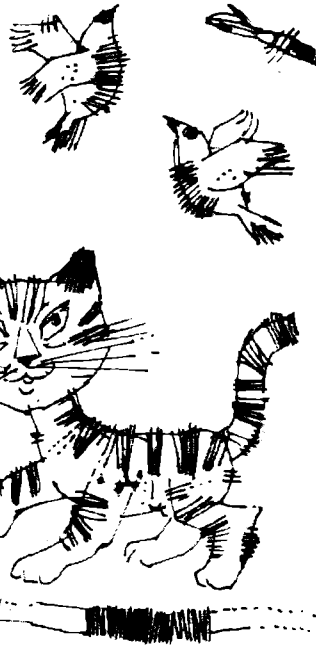

‘ওই তো নাদিয়া কোমানেচি’

সোমা দত্ত

উষা আমাকে আর সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেও দু-একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমাদের মেয়ে-দলের মনিটর আসলে গীতা। বন্দনা, সাইনি, বালসাম্মা, উষা ও আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় গীতা ঘুত্‌সি। ওরা সবাই অ্যাথলিট। আর আমি শুটার। মুশকিলটা হল এখানেই। ওরা পাঁচজন একই জায়গায় প্র্যাকটিসের জন্য যেত। আমার শুটিং-রেঞ্জ বহু দূরে, ভিলেজ থেকে পাক্কা ৬৫ মাইল— চিনো বলে একটা জায়গায়। ব্রেকফাস্ট টেবলে ওদের সঙ্গে দেখা হত। তারপর আমি চলে যেতাম সারাদিনের জন্য রেঞ্জে। রাতে অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ওদের সঙ্গে ফের দেখা হত। কথাবার্তা সীমাবদ্ধ থাকত প্র্যাকটিস, ওদের টাইমিং আর আমার স্কোর সম্পর্কেই। আসলে তখন আমরা যে যার কম্পিটিশন নিয়েই ভাবছি।

গীতা-বন্দনা-সাইনি রোজ বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গুজুর-গুজুর করত। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগত। কোনো-কোনোদিন ওরা ফিরতও অনেক দেরি করে। পাকা দাড়িওয়ালা এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক মাঝে-মাঝে চক্কর মেরে দেখতেন মেয়েরা কী করছে। বেচাল কিছু দেখলেই গীতাকে ডেকে বকুনি দিতেন। যা কিছু ঝড়ঝাপ্টা গীতার ওপর দিয়েই যেত। পরে জেনেছিলাম, ভদ্রলোকের নাম যোগিন্দর সিং সাইনি। অ্যাথলেটিকস টিমের কোচ।

উষা ও বালসাম্মা কিন্তু আড্ডা একেবারেই পছন্দ করত না। নিজেদের মধ্যে কথাও বলত খুব কম, একই রাজ্যের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও।

আমার খুব অবাক লাগত দুজনকে দেখে। দুজনের কোচই লস অ্যাঞ্জেলেস গিয়েছিলেন। উষার কোচ নাম্বিয়ার দিলখোলা, ছটফটে মানুষ। আমাদের উলটো দিকের ঘরে থাকতেন। উষাকে সব সময় কোচ নাম্বিয়ারের সঙ্গে দেখতাম। ওরা মালয়ালি ভাষায় যে কী আলোচনা করতেন, কিছুই বুঝতে পারতাম না। ওদের তুলনায় বালসাম্মাকে মনে হত নির্জীব। কেমন যেন সঙ্কোচ নিয়ে কথাবার্তা বলত বা চলাফেরা করত। ওর কোচ কুট্টি খুব গম্ভীর ধরনের। তবে আচার-আচরণে ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল না। জানি না, কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা, অলিম্পিক শুরু হবার আগের দশদিন আমাদের মেয়েদের যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে— ওরা কেউ জেতার মনোভাব নিয়ে যায়নি। এখানে এসেছি, অংশ নেব, ব্যস ওইটুকুই।

আমাদের হোস্টেলের ঠিক ওপর তলাতেই ছিল ফরাসিরা। ওরা যে কী রকম আমুদে, তা টের পেতাম আমরা রোজই। হোস্টেলে লিফট ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার পথে ওদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। নীচের তলায় থাকত নাইজিরীয়রা। ওরা ভীষণ গান ভালবাসত। চড়া ভল্যুমে গান বাজাত। একতলায় একপাশে ছিল ছোট্ট একটা গ্যারাজ। প্রায় প্রতিদিন ভোরবেলায় দেখতাম, ওখানে ওরা টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে মিউজিকের তালে তালে ব্যায়াম করছে। এটা কেন করত, আজ পর্যন্ত আমার মাথায় ঢোকেনি।

ভিলেজে যাওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই আমি একটা কাণ্ড করেছিলাম। প্র্যাকটিসের জন্য তখন একা-একাই বাসে যাতায়াত করতাম। সেদিন ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। লাস্ট বাস যেখানে আমাকে নামাল সে-জায়গাটা আমার অপরিচিত। ওদিকে আবার রাত হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আবিষ্কার করলাম, আমি হারিয়ে গেছি। ভিলেজটা বিশাল। আমাদের বাগবাজারের পুরোটাই ওর পেটে ঢুকে যাবে। বাড়িগুলিও সব মেটে রঙের। আমাদের হোস্টেলটা ছিল ওলিম্পিক সুইমিং-পুলের কাছেই। পুলের বাইরের খুঁটিতে বিভিন্ন দেশের পতাকা দেখে চিনতে পারতাম হোস্টেলে এসে গেছি। এখন কী করব? এই সব আকাশ-পাতাল যখন ভাবছি, তখন সাদা স্কার্ট আর নীল জ্যাকেট-পরা একটা মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি কোনো অসুবিধেয় পড়েছ?”

ভাল করে দেখতেই বুঝতে পারলাম, এই পোশাকটা অ্যাটাশেদের! আমার বিপত্তির কথা শুনে শেষ পর্যন্ত ওই মেয়েটাই আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ভিলেজে আর একদিন তো হৈ-হৈ ব্যাপার! বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কয়েকটা বাড়ির ওপাশে ছোটখাটো একটা

রোমানিয়ার সেই সোনার মেয়ে

ভিড়। একটা দমকলের গাড়িও সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড কৌতূহল হল। নীচে নেমে দেখি একটা বাড়ির সামনে পুলিশের লোকও রয়েছে। ব্যাপারটা কী ? শুনলাম, ওই হোস্টেলে নাকি একটা টাইম-বোমা কে যেন রেখে গেছে। টেলিফোনে খবর পেয়ে পুলিশ হোস্টেলটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে। খবরটা কানে যেতেই আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বোমাটা যদি ফাটে ! ওই হোস্টেলের অ্যাথলিটদের আগেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চারদিকের উদ্বিগ্ন মুখগুলো দেখে হঠাৎ আমার উত্তেজনাটা থিতিয়ে গিয়ে রাগ হল প্রচণ্ড। এটা কী ধরনের অসভ্যতা ! আমরা এখানে খেলতে এসেছি, কোনো অপরাধ তো করিনি। এই যখন অবস্থা তখন বাড়ির ভেতর থেকে একদল পুলিশ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার ? পরে জানতে পারলাম, বাথরুম থেকে পুলিশ একটা সন্দেহজনক প্যাকেট উদ্ধার করেছে, কিন্তু সেটা খুলে দেখা গেছে ভেতরে রয়েছে শুধুই টয়লেট-পেপার। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেদিন সবাই দমকা হাসিতে ফেটে পড়েছিলাম।

সকালে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যেত হেলিকপ্টারের আওয়াজে। রাত ছিল বেশ ছোট। দিনের আলো থাকত রাত প্রায় সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত। ভারতের সময়ের সঙ্গে পার্থক্য প্রায় বারো ঘণ্টার মতো। অর্থাৎ কিনা, ভিলেজে আমরা যখন ভোরবেলায় বিছানায় আড়মোড়া ভাঙছি, তখন কলকাতার লোকরা সন্ধেবেলায় টিভিতে আগের দিনের ওলিম্পিক প্রোগ্রাম দেখছে।

ভোরবেলা থেকেই ভিলেজ সরগরম হয়ে উঠত। কেউ জগিংয়ে ব্যস্ত, কেউ হাঁটা প্রতিযোগিতায় নামার আগে প্র্যাকটিস সেরে নিচ্ছে, কেউ ব্যায়াম করছে। চারদিকে ব্যস্ততা। ট্র্যাকস্যুট, গেঞ্জি ও শর্টস-পরা অ্যাথলিটরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ছে মাঠে গিয়ে প্র্যাকটিস করার জন্য। সব থেকে ভাল লাগত আমার জার্মান ও জাপানিদের। এক-একজনের এক-একরকম ট্র্যাকস্যুট। আর কী সুন্দর সব ডিজাইন। আমার খুব লোভ হত ওদের ট্র্যাকস্যুটগুলো দেখে। আমাদের ট্র্যাকস্যুটে বৈচিত্র্য নেই। নীল রঙ। আরও উজ্জ্বল রঙের হলে ভাল হত।

একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি। আমাদের দল দেশ থেকে দু-দফায় লস অ্যাঞ্জেলেসে এসেছিল। পুরো দল পৌঁছবার পরে একদিন শেফ দ্য মিশন দয়া সিং সাঁধু বললেন, "ভিলেজের মেয়র আমাদের দলকে আজ বিকেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তোমরা সবাই ব্লেজার পরে রেডি হয়ে থাকবে।"

ভিলেজটা ছিল আলাদা একটা শহরের মতো। এর সর্বময় কর্তা মেয়র। তাঁর ওপর কারও কথাই খাটবে না। এমনকী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রেগনকেও ভিলেজের ভেতরে মেয়রের কথা শুনে চলতে হবে। ওখানে নিয়ম হচ্ছে, যে দেশ ভিলেজে থাকবে, তার পতাকা উড়বে। দয়া সিং সাঁধু তো ফতোয়া দিয়ে গেলেন, ব্লেজার পরে যেতে হবে। আমার ব্লেজারের কী অবস্থা তা তো উনি জানেন না।

আমি দিল্লি থেকে ওলিম্পিকে যাইনি। সেজন্য ব্লেজারের মাপও দিতে পারিনি। আমার জন্য দিল্লি থেকে আন্দাজে একটা ব্লেজার আই ও এ পাঠিয়ে দিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছিল আমাদের আর-এক বাঙালি শুটার ভগীরথ সামই। সেই ব্লেজার গায়ে চাপিয়ে দেখি, হাতাদুটো একেবারে ঢোলা। পরে হাসি আর চাপতে পারি না। এটা পরেই জাতীয় পতাকা তোলার জন্য মেয়রের অনুষ্ঠানে যেতে হবে। অগত্যা হাতা দুটো ভেতরের দিকে গুঁজে কোনোরকমে মাপসই করে ওখানে যেতে হল। অনুষ্ঠানের সময় মেয়র ওলিম্পিক গেমস সম্পর্কে কয়েকটা কথা বললেন। তারপর উপহারের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন প্রত্যেকের হাতে। হোস্টেলে ফিরে প্যাকেট খুলে দেখি, নিত্যব্যবহার্য সব জিনিসপত্র— সাবান, তেল, তোয়ালে, চিরুনি, সুতো ও সুঁচ। সঙ্গে আছে ওলিম্পিকের একটা বই। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, সুঁচ-সুতো ওখানে কোন্ কাজে লাগবে। কিন্তু লেগেছিল— এই দুটো জিনিসই মার্চপাস্টের দিন আমাকে দারুণভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সত্যি বলতে কী, দিল্লি এশিয়াডের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই লস অ্যাঞ্জেলেসে ওলিম্পিক আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়নি। এখন যখন মনে মনে তুলনা করি, তখন বেশ বুঝতে পারি আমাদের এশিয়াড ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ওলিম্পিকের চেয়েও ভাল হয়েছিল। দিল্লিতে সব প্রতিযোগী থাকত একই ভিলেজে। চব্বিশ ঘণ্টা মিনিবাস চক্কর মারত ভিলেজে। যাতায়াতের অসুবিধে ছিল না একটুও। এই ব্যবস্থাটা ওলিম্পিকে কিন্তু ছিল না। ভিলেজের একটা পয়েন্ট পর্যন্ত বাস আসত। তারপর হাঁটতে হত।

এশিয়াডে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা ছিল চমৎকার। নানা ধরনের খাবার ডাইনিং হলে পাওয়া যেত। ওলিম্পিকে খাবারের আইটেম তুলনায় কম ছিল। অবশ্য এই খাবারগুলো খারাপ ছিল না। গেমস চলাকালীন ভারতীয় সাংবাদিকরা যখন ভিলেজে এসে আমাদের খোঁজখবর নিতেন তখন আমাদের মধ্যে অনেককে বলতে শুনতাম— খাবার পছন্দ হচ্ছে না তাদের। আমি জানি, খাবার মনোমতো না হওয়ায় আমাদের অনেক শুটার ওখানে না খেয়েও থেকেছেন। খাওয়া নিয়ে এই খুঁতখুঁতি খেলোয়াড়দের অন্তত করা চলে না। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে রসনাতৃপ্তির আশা করা তো একেবারেই উচিত নয়। সব রকম খাবারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকার ফলে ভিলেজের খাবারদাবারে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। ওদের খাবারে মসলা কম, কিন্তু খাবার বেশ পুষ্টিকর। তবে, মসলা ছাড়া খাবার আমাদের মুখে রুচবে কেন ?

সোমার শুটিং প্র্যাকটিস

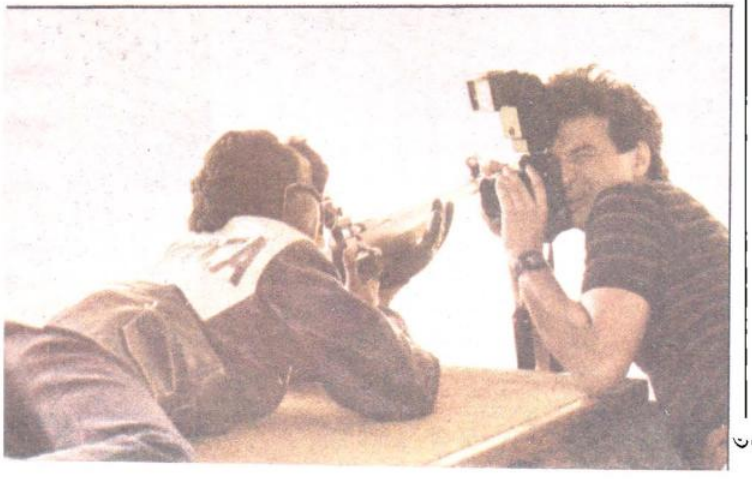

কোচের সঙ্গে সোমা (লস অ্যাঞ্জেলেস শুটিং-রেঞ্জে)

খাবারের প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। একদিন রাতের খাবার খেয়ে ডাইনিং-হল থেকে ফেরার সময় দেখি, গরম জামা গায়ে একটি ছেলে রাস্তায় ঘুরছে। কাছে আসতেই দেখলাম, ছেলেটি কমলাকান্ত সাঁতরা। ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ভগীরথ সামই। আমরা তিন বাঙালি সেদিন মন খুলে নিজেদের ভাষায় কথা বলেছিলাম। সে যাক, ওকে ওই অবস্থায় দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, "এ কী, এই গরমে এসব পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?" ও বলল, "আমার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। তাই কমাবার চেষ্টা করছি।" শরীরের ওজন বেড়ে গেলে কী হয়— সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আর তা কমাবার জন্যই বা এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে কেন, তাও আমার মাথায় ঢোকেনি।

কমলাকান্ত বলল, "আমরা ওয়েট-লিফটিং করি তো, সেজন্য কম্পিটিশনে নামার জন্য আমাদের শরীরের ওজন বেঁধে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট ওজনের বেশি হলেই বাদ পড়ে যাব। আমার ওজন এখন চার কেজি বেড়ে গেছে। যে করেই হোক, কমাতে হবে।" খুব হালকা সুরে কথাগুলো ও বলেছিল।

ডাইনিং-হলে মাঝে-মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হত। কিন্তু, ওইদিনের পরে আর ওকে দেখিনি। কলকাতায় ফিরে শুনলাম ওজন বেড়ে যাবার জন্য ওকে নাকি দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। শুনে সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

ডাইনিং-হলে যাবার জন্য আমাদের মিনিট-পাঁচেক হাঁটতে হত। ওখানে যেতে বেশ মজা লাগত আমার। সাদা, কালো, বাদামি, হলুদ, লালচে— নানা রঙের মানুষ গিজগিজ করছে। একটি জাপানি মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেও শুটার, ছোট্ট চেহারা, বয়সে কিন্তু আমার ডবল। নাম নোরিকো। কোনো-কোনো দিন একসঙ্গেই ডিনার খেতে যেতাম। একদিন দু-জনে বসে খাচ্ছি, এমন সময় নোরিকো বলল, "সোমা, ওই টেব্‌লের দিকে তাকাও।" তাকিয়ে দেখি সাত-আটজন মেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। জ্যাকেটে লেখা রোমানিয়া।

আমি কৌতূহল না দেখিয়ে ফের খাওয়ায় মন দিতে নোরিকো আবার বলল, "ওই মাঝের মেয়েটাকে দেখো। ওই তো নাদিয়া কোমানেচি।" ঝাঁকুনি খেলাম। ছোটবেলা থেকে নাদিয়ার নাম শুনে আসছি। মনট্রিয়ল ওলিম্পিকখ্যাত সেই অসাধারণ জিমনাস্ট নাদিয়া কোমানেচির মাত্র কয়েক হাত দূরে আমি বসে আছি ! হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। আশেপাশের মেয়েরাও সম্ভবত জিমনাস্ট। নাদিয়াকে ঘিরে ওরা গল্প করতে করতে খাচ্ছিল। খাওয়া শেষ করে একসময় ওরা চলেও গেল। এর মধ্যে অনেকবার ভাবলাম, উঠে গিয়ে আলাপ করে আসি। কিন্তু কেন জানি না, সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। এখন ওই দিনটার কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। এত মিশুকে হওয়া সত্ত্বেও কেন আমি সেদিন আলাপ করতে পারলাম না ওর সঙ্গে ! (ক্রমশ)

লালচুল সমিতি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মিঃ উইলসনের অনুরোধে হোমস লালচুল সমিতির ব্যাপারে তদন্ত করতে রাজি হয়েছে। মিঃ উইলসনের কথা শুনে, তাঁর বাড়ির ধারকাছ পরীক্ষা করে, তাঁর সহকারীকে দেখে হোমস বুঝতে পেরেছে যে, ব্যাপার গুরুতর। লালচুল সমিতির লোকেরা গভীর জলের মাছ। তাদের ধরবার জন্যে আজ রাত্তিরে হোমস সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মেরিওয়েদার, পুলিশ-ইন্সপেক্টর জোনস আর ওয়াটসনকে নিয়ে ওত পেতে বসে আছে···

॥ ৪ ॥

মিঃ মেরিওয়েদার কোনো কথা না বলে একটা বড় কাঠের বাক্সের উপর বসলেন। গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা গেল যে, তিনি বেশ অপমানিত বোধ করছেন। হোম্‌স একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস নিয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও মেঝেতে শুয়ে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় মাঝখানের সূক্ষ্ম জোড়গুলি পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। এইভাবে যখন ঘরের সম্পূর্ণ মেঝেটা তার পরীক্ষা করা হয়ে গেল, তখন সে বেশ প্রফুল্লভাবে বলল, "আমাদের হাতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় আছে। উইলসন ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। কিন্তু তারপর ওরা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবে না। কেন না যত তাড়াতাড়ি ওরা কাজ হাঁসিল করতে পারবে, এখান থেকে পালাবার তত বেশি সময় পাবে। ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, আমরা এই মুহূর্তে লণ্ডন শহরের একটা বড় ব্যাঙ্কের সিটি ব্রাঞ্চের সেফ ডিপোজিট ভল্টের মধ্যে রয়েছি। মিঃ মেরিওয়েদার এই ব্যাঙ্কের পরিচালক-সভার সভাপতি। আর তিনি এখনই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন কেন জন ক্লে-র মতো ঘাগি অপরাধীর নজর পড়েছে এই সেফ ডিপোজিট ভল্টের উপর।"

ফিসফিস করে মিঃ মেরিওয়েদার আমাকে বললেন, "এ সবের মূলে আছে আমাদের ফরাসি সোনা। আর এই সোনা চুরি যেতে পারে বলে আমাদের অনেকবার হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আমরাও যতদূর সম্ভব সতর্ক আছি।"

"ফরাসি সোনা আবার কী জিনিস ?"

"বলছি। কয়েক মাস আগে হঠাৎ খুব জরুরি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমরা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রায় তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মতো নেপোলিয়ন ফ্রাঁ ধার করতে বাধ্য হই। কিন্তু যাই হোক ঐ টাকাটা আমাদের খরচা করতে হয়নি। কিন্তু সে টাকাটা যে আমাদের কাছেই আছে এবং এখনো ফেরত পাঠানো হয়নি সে খবরটা কিন্তু চাপা থাকেনি। এই যে কাঠের বাক্সটা দেখছেন, ডঃ ওয়াটসন, যেটার ওপর আমি বসে আছি এর ভেতরে তামার পাতের ভাঁজে-ভাঁজে অন্তত দু-হাজার সোনার নেপোলিয়ন ফ্রাঁ আছে। সাধারণভাবে ব্যাঙ্কের শাখায় যত সোনা মজুত রাখা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ সোনা আমাদের ব্যাঙ্কে রয়েছে। এই নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তারও শেষ নেই।"

"সে তো বটেই," হোম্‌স বললে। "এইবার কিন্তু আমাদের তৈরি হতে হবে। আমি অনুমান করছি যে, যা ঘটবার তা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘটবে। এইবার লণ্ঠনটা ঢাকা দিয়ে দিতে হবে।"

"সে কী, আমাদের অন্ধকারে বসে থাকতে হবে," মিঃ মেরিওয়েদার যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

"উপায় নেই মিঃ মেরিওয়েদার। আমি তো পকেটে এক প্যাকেট তাস এনেছিলুম। ভেবেছিলুম চারজনে তাস খেলে সময় কাটানো যাবে। কিন্তু এখানে এসে যা দেখছি তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, শত্রুপক্ষের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যে-কোনো মুহূর্তে তারা কাজ শুরু করতে পারে। সুতরাং এখন এখানে আলো জ্বালিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তারা সাবধান হয়ে যাবে। এখন আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমরা কে কে কোথায় থাকব। একটা কথা আপনাদের বলে রাখি। এরা যেমন বেপরোয়া তেমনি নিষ্ঠুর। যদিও আমাদের এখানে দেখে তারা খানিকটা হকচকিয়ে যাবে ঠিকই, তবুও আমরা যদি যথেষ্ট সাবধান না হই তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদ হতে পারে। আমি এই বাক্সটার পেছনে দাঁড়াব। আপনারা ঐ বাক্সগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন। আমি ওদের মুখের ওপর আলো ফেললেই আপনারা ছুটে আসবেন। ওদের আমরা একেবারে ঘিরে ফেলব। ওরা যদি গুলি ছোঁড়ে, ওয়াটসন, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়বে।"

আমি রিভলভারের সেফটি ক্যাচটা খুলে সেটা বাক্সর ওপর রেখে নিজে বাক্সর আড়ালে দাঁড়ালুম। হোম্‌স তার হাতের লণ্ঠনটা ঢেকে দিলে। আর অমনি ঝুপ করে গাঢ় অন্ধকারে সব কিছু ঢেকে গেল। সত্যি কথা বলতে কী অন্ধকার যে ও-রকম জমাট আর নিরেট হতে পারে আমার সে ধারণা ছিল না। শুধু আড়াল করা লণ্ঠন থেকে যে অত্যন্ত মৃদু তাপ বেরুচ্ছিল তাতে মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলুম যে যাই হোক হাতের কাছে একটা আলো আছে আর দরকারে সেটাকে কাজে লাগানো যাবে। কী জানি কী ঘটবে এই ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল বলেই হোক অথবা ঐ মাটির নীচের অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরের বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধের জন্যেই হোক মনের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ হচ্ছিল।

খুব নিচু গলায় হোম্‌স বললে, "ওদের পালাবার একটি মাত্রই রাস্তা আছে। সেটা হল ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার ধরে। জোন্‌স, তোমাকে যা করতে বলেছিলুম তা করেছ ?"

"হ্যাঁ। ঐ বাড়ির সদর দরজায় একজন ইন্সপেক্টর আর দু'জন কনস্টেবল হাজির আছে।"

"যাক। তাহলে পালাবার রাস্তা বন্ধ। এখন আমাদের কাজ চুপচাপ বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করা।"

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে সময় যেন আর কাটতেই চায় না।

পরে অবশ্য আমি হিসেব করে দেখেছি যে আমরা সেফ ডিপোজিট ভল্টে ছিলুম বড় জোর দেড় ঘণ্টা। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল যে কতক্ষণ যে বসে আছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মনে হচ্ছিল রাত বোধহয় কেটে গিয়ে ভোর হতে আর দেরি নেই। ঠায় একভাবে বসে থেকে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তবু পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে আমি একটুও নড়াচড়া করিনি। সেই অন্ধকার ঘরে অজানা বিপদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার কান এত সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল যে, আমি যে কেবল আমার সঙ্গীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম তাই নয়, প্রত্যেকের নিশ্বাস নেবার ও ছাড়ার আলাদা ছন্দও ধরতে পারছিলুম। জোন্‌স বেশ ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস নিচ্ছিল। কিন্তু মেরিওয়েদারের নিশ্বাসের শব্দ খুবই ক্ষীণ। আমি যে বাক্সটার আড়ালে ছিলুম সেখান থেকে ঘরের মেঝেটা খুব ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা অতি ক্ষীণ আলোর রশ্মি যেন ফুটে উঠল।

প্রথমে মনে হল মেজের ওপর একটা আলো দপ্ করে জ্বলেই নিবে গেল। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে একটা লম্বা উজ্জ্বল হলদে রেখার আকার নিল। তারপর আমি কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একটা ফর্সা অল্পবয়েসী ছেলের হাত উঠে এল। প্রায় এক মিনিটের মতো সেই হাতটা চার পাশে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন খুঁজে যেমন নিঃশব্দে উঠে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু পাথরের মেজের একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে তলা থেকে আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল। হাতটা অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাটির তলা থেকে হঠাৎ একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দেখলুম মেজের একটা পাথর সরে সেখানে একটা মাঝারি আকারের চৌকো গর্ত হয়ে গেছে। সেই গর্ত দিয়ে বেশ জোরালো আলো এসে ঘরে পড়ল। তারপর গর্ত দিয়ে উঁকি মারলে নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো একটি অল্পবয়সী ছোকরার মুখ। ছেলেটি অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ওপরে উঠে এল। উঠে এসেই সে হাত বাড়িয়ে আর-একজনকে টেনে তুললে। সঙ্গীটি তারই মতো ছোটখাটো। কিন্তু তার মাথার চুল রক্তের মতো লাল।

প্রথম ছোকরাটি বললে, "সব ঠিকঠাক আছে। তুমি ছেনি আর থলেগুলো আনতে ভোলোনি তো ? কী সর্বনাশ ! আর্চি তুমি পালাও ! আমি এ-দিকটা দেখছি।"

সে কিছু দেখবার আগেই শার্লক হোম্‌স এক লাফে তার জামার কলারটা শক্ত করে চেপে ধরলে। আর তার সঙ্গী গর্ত দিয়ে লাফ মারতেই একটা ফ্যাঁস করে শব্দ হল। জোন্‌সের হাতে খানিকটা জামা ধরা রয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় একটা রিভলভারের নল চকচক করে উঠতেই হোম্‌স তার চাবুক দিয়ে লোকটার কব্জিতে প্রচণ্ড জোরে এক ঘা দিতেই রিভলভারটা ঠং করে মেজেতে ছিটকে পড়ল।

"এখান থেকে পালাবার চেষ্টা বৃথা জন ক্লে"—হোম্‌স বললে।

একটুও বিচলিত না হয়ে ক্লে বললে, "হুঁ, তাই তো দেখছি। তবে আমি খুশি যে, আমার সঙ্গীর খানিকটা জামা তোমরা ধরতে পেরেছ। তাকে পারোনি।"

"তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোক সদর দরজায় হাজির আছে।" হোম্‌স ক্লের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"তাই নাকি ? তা হলে তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়।"

হোম্‌স বললে, "ধন্যবাদ। তবে তোমার বুদ্ধিরও প্রশংসা করছি। সত্যি, তোমার ঐ লালচুল সমিতির আইডিয়াটা অসাধারণ।"

ক্লে উত্তর দেবার আগে জোন্‌স বলে উঠল, "নাও আর বেশি চিন্তা কোরো না, এখনি তোমার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তোমার ও বন্ধুটি দেখলুম গর্তের মধ্যে ঢুকতে খুব ওস্তাদ। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো হাতদুটো বাড়িয়ে দাও, হাতকড়াটা লাগাই।"

উত্তরে জন ক্লে যা বললে তা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। "হাতকড়া লাগাতে পারো। তবে তোমার ঐ নোংরা হাত যেন আমার গায়ে না লাগে। আর তুমি হয়তো জানো না যে, আমার শরীরে রাজরক্ত আছে। আমি খুশি হব যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় 'মহাশয়', 'অনুগ্রহপূর্বক' বা ঐ ধরনের সম্ভ্রমসূচক শব্দ ব্যবহার করো।"

বেশ ব্যঙ্গ করে জোন্‌স বললে, "বুঝেছি মহাশয়। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করে ওপরে গিয়ে দয়া করে গাড়িতে বসেন তো মহাশয় আমি কৃতার্থ হই।"

"ঠিক আছে," বলে আমাদের তিনজনকে বিদায় জানিয়ে জন ক্লে জোন্‌সের সঙ্গে চলে গেল। আমরাও ওদের পেছন পেছন চললুম।

"সত্যি মিঃ হোম্‌স, কী ভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব তা

শার্লক হোমসের গল্পমালায় নতুন গল্প

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে চলবে

জানি না। আপনার জন্যেই এত বড় চুরিটা ঠেকানো গেল। আপনাকে যে পরিমাণ ফি দিতে হবে বলবেন, ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আমরা সানন্দেই তাই দেব," মিঃ মেরিওয়েদার বললেন।

"লালচুল সমিতির অভিনব রহস্যের সমাধান করে ও জন ক্লে-কে জোন্‌সের হাতে তুলে দিতে পেরেই আমার পুরস্কার মিলে গেছে। আপনাদের আলাদা করে আর কিছু দিতে হবে না। তবে এ ব্যাপারে আমার কিছু খরচা হয়েছে, আপনারা যদি সেটা আমাকে দিয়ে দেন তো খুশি হই। আসলে জন ক্লে-র সঙ্গে আমার নিজের কিছু বোঝাপড়া ছিল। আর সেই জন্যেই আমি এই 'কেস'টা হাতে নিই। আচ্ছা চলি।"

আমরা বেকার স্ট্রিটের দিকে চললুম।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমার অনুরোধে শার্লক হোম্‌স সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে।

"আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারি যে, লালচুল সমিতির ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করবার কাজ দিয়ে সাদাসিধে ভাল মানুষটিকে মানে আমাদের মক্কেল উইলসনকে তার বাড়ি থেকে রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে বের করে আনা। সমস্ত পরিকল্পনাটা জন ক্লে করে। মিঃ উইলসন এমনিতে বাড়ি থেকে বেশি বের হন না। তাই ক্লে ঐ সপ্তাহে চার পাউণ্ডের টোপ দেয়। আর মিঃ উইলসন সেই টোপটি গিলে ফেলেন। উইলসনের কর্মচারীটির ওপর আমার সন্দেহ হয় যখন জানতে পারলুম যে ও অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে রাজি হয়েছে।"

"কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যটা তুমি বুঝলে কী করে?"

"উইলসনের নিজের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তা হলে তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে সেখানে ওরা কী করতে পারে? আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, তারা যে জিনিসের সন্ধান করছে সেটা হয়তো তার বাড়ির কাছাকাছি আছে। কিন্তু সেটা কী? ভাবতে ভাবতে আমার মিঃ উইলসনের একটা কথা মনে পড়ল। উনি বলেছিলেন যে ওঁর কর্মচারীটির ছবি-তোলার ভীষণ নেশা। অবসর পেলেই সে তয়খানার ডার্করুমের ছবি ডেভালপ করতে চলে যায়। তয়খানা! মানে মাটির তলার ঘর। তৎক্ষণাৎ একটা বড় জট খুলে গেল। তখন আমি ঐ কর্মচারীটির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলুম। জানলুম যে এবারে এক মহা ধুরন্ধর লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তখন আমি ভাবতে লাগলুম যে, এই লোকটি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ তয়খানায় কী করে? ভাবতে ভাবতে একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা মনে এল, ও নিশ্চয়ই একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। কিন্তু কেন?

"এই রকম অবস্থায় আমরা অকুস্থলে গেলুম। তুমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলে যে কেন আমি ফুটপাথে ঠক-ঠক করে লাঠি ঠুকছিলুম। আমি বুঝতে চাইছিলুম যে, তয়খানাটা বাড়ির কোন্ দিকে গেছে, সামনে না পেছনে। বুঝলুম সামনের দিকে নয়। তখন আমি দরজায় ধাক্কা দিলুম। যা আশা করেছিলুম, ঐ কর্মচারীটি দরজা খুলে দিলে। যদিও ইতিপূর্বে ক্লে-র সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার সংঘাত হয়েছে, কিন্তু আমরা কখনও পরস্পরের মুখোমুখি হইনি। তাছাড়া ওর হাঁটুটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। দেখছিলুম যে, ওর হাঁটুর কাছে প্যান্টের কাপড়টা কোঁচকানো, ধুলোবালি লাগা। আমি নিঃসন্দেহ হলুম যে, দীর্ঘক্ষণ ধরে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে ঐ দাগ হয়েছে।

"তারপর হাঁটতে-হাঁটতে মোড়ের কাছে এসে যখন সিটি অ্যাণ্ড সুবার্বান ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চটা নজরে পড়ল তখনই আমি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলুম। বাজনার পর তুমি যখন বাড়ি চলে গেলে তখন আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করলুম। তার ফল কী হল তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখলে।"

আমি বললুম, "কিন্তু আজ রাত্তিরেই যে ওরা সেফ ডিপোজিট ভল্ট ভাঙবে সেটা তুমি কী করে জানলে?"

"যখন লালচুল সমিতি বন্ধ হয়ে গেল তখনই বুঝলাম যে, জাবেজ উইলসনকে ওদের আর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ওদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ। কিন্তু সুড়ঙ্গটা খুঁড়ে তো বেশি দিন ফেলে রাখা যায় না। যা করবার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। তখন আমার মনে হল যে, আজ শনিবারই ওদের পক্ষে সব চেয়ে ভাল। কাল রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। চুরির খবর কেউ জানবে না। ওরাও বমাল কোনো নিরাপদ জায়গায় গা-ঢাকা দেবার জন্যে পুরো দুটো দিন সময় পাবে। সুতরাং ওদের যা কিছু করবার তা আজ রাত্রেই করতে হবে।"

হোম্‌স চুপ করলে। আমি বললুম, "চমৎকার। তোমার বিশ্লেষণে এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

বিভিন্ন সময়ে চারজন ক্রিকেটার যেমনভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিলেন, তেমনটি আর কেউ পারেননি। একেবারে গোড়ার দিকে লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন এবং জর্জ হেডলি, পরে ফ্রাংক ওরেল, ও গ্যারি সোবার্স। এঁরা চারজনেই বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার। যেমন স্বদেশে, তেমনি বিদেশেও এঁদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্ত নেই।

এঁদের মধ্যে দু'জন পিতৃতুল্য সম্মান পেয়েছিলেন ক্যারিবিয়ানদের কাছে। এক, জর্জ হেডলি ; দুই, ফ্রাংকি। হেডলি, পরবর্তী সময়ে, 'ফাদার অব ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট' এই বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন অধিকাংশ সময়। আর ওরেল ? আজও তাঁর কথা উঠলে, শ্রদ্ধায় আবেগে গলা ধরে আসে প্রতিটি ক্রিকেট-প্রেমিকের। এঁরা প্রত্যেকে মানুষের হৃদয়ে কতখানি জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন তার ভূরি ভূরি নজির আছে অজস্র ঘটনার মধ্যে। হেডলির একটা গল্প বলি তোমাদের। এতেই বুঝতে পারবে কীরকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তিনি। প্রখ্যাত ক্রিকেট লেখক সি· এল· আর জেমস যাকে বলেছেন, অভাবনীয় জনপ্রিয়তা।

'৫৩-৫৪ সালে জামাইকাতে ঘটনাটা ঘটেছিল। জামাইকার মানুষ হেডলি বলতে একেবারে অজ্ঞান। নেট প্র্যাকটিস হচ্ছে। সফরকারী ইংল্যাণ্ড দলের শক্তি সাংঘাতিক। দলে আছেন হাটন, মে, কম্পটন, গ্রেভনি, ট্রুম্যান, বেইলির মতো খেলোয়াড়রা। বিশ্বজোড়া নাম তাঁদের। কাজেই ইংরেজরা যেখানে প্র্যাকটিস করছিল তার পাশে বেড়ার ধারে ভিড় জমাল উৎসাহী দর্শকরা। শুধু ভিড় জমাল বললে ব্যাপারটাকে ঠিকমতো বলা হয় না। ভিড়ের চাপে বেড়া ভেঙে পড়ার যোগাড়। অন্য দিকে, যেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করছে, তেমন লোকজন নেই। সংখ্যায় অতি নগণ্য। ইংরেজদের নেটের কাছে ভিড়ের তুলনায় নস্যি। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর হঠাৎ তীব্র উল্লাসধ্বনি শোনা গেল মাঠ জুড়ে। আর দেখা গেল, ইংল্যাণ্ডের নেটের সামনে ভিড় করা মানুষগুলো উর্ধ্বশ্বাসে অন্য নেটের দিকে দৌড়চ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাচ্ছে—'রাজা জর্জ, রাজা জর্জ'। মহা আশ্চর্য হয়ে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপার কী ? এত চিৎকার কিসের ? রাজা জর্জই বা কে ?

ব্যাপার আর কী, মাঠে নামছেন হেডলি। জামাইকার মানুষ আদর করে তাঁকে 'রাজা জর্জ' বলে বলে ডাকত। তাঁবুর সিঁড়িতে হেডলির চেহারা দেখামাত্রই মানুষগুলো উল্লাসে অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। আর যখন দেখল ব্যাট হাতে করে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন তিনি, অমনি সব ভুলে তারা চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় লাগাল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেটের দিকে। হেডলি তো ওখানেই প্র্যাকটিস করবেন। ইংরেজদের গালে হাত। বাপ্ রে, এত জনপ্রিয়তা ! হ্যাঁ, এতটাই। হেডলি জামাইকার আদরের ধন। হৃদয়ের রাজা। ওই বছর এম· সি· সি·'র বিরুদ্ধে খেলবার জন্য হেডলিকে চাই। কিন্তু পয়সার টানাটানি চলছে। ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁকে আনাতে হলে বিস্তর পয়সার দরকার। কানাকানি হতে হতে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, পয়সা যোগাড় না হলে হয়তো হেডলি ছাড়াই খেলা হবে জামাইকায়। অসম্ভব, লাফিয়ে পড়ল জামাইকার মানুষ। আনাতেই হবে জর্জকে। সে ছাড়া জামাইকায় এ-খেলা হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। টাকা চাই ? আমরা দেব। যত লাগে। যেভাবে পারি, দেবই। হেডলির আসা চাই। চাঁদা তোলা শুরু হল, এবং অল্প সময়ে যোগাড় হয়ে গেল তিন হাজার পাউণ্ড। ব্যস, সমস্যার সমাধান। হেডলির প্রতি এমনি ছিল তাদের সুগভীর টান। এমনি ভালবাসা।

কনস্ট্যানটাইনের কথায় আসি। আবার সি এল আর জেমসের একটা লেখার কথা মনে পড়ছে। তিনজন অথবা পাঁচজন খুঁতখুঁতে নির্বাচক মহাশয়কে আলাদা আলাদা ঘরে বসিয়ে হাতে একটুকরো কাগজ-পেন্সিল দিয়ে অনুরোধ করুন ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচাইতে সেরা দল গড়ে দেবার। বাজি রেখে বলতে পারি, পাঁচজনই সযত্নে কনস্ট্যানটাইনকে রাখবেন। এবং 'কেন', এই প্রশ্নের উত্তরে পাঁচজনই বেশ অনায়াস চালে বলবেন, শুধু ফিল্ডিং করার জন্যও লিয়ারিকে চোখ বুজে নির্বাচিত করা যায়। বুঝে দ্যাখো, দক্ষতার কোন শীর্ষে পৌঁছলে তবে এমন কালজয়ী ইমেজ গড়ে তোলা যায়।

তাঁর সতীর্থরা বলেছেন, "এমন অনেক ক্যাচ তিনি ধরেছেন, যা সঠিক অর্থে ক্যাচ নয়। লিয়ারি ক্যাচ তৈরি করে নিয়েছেন। ক্রিকেট সম্পর্কে বেশ জানে, বোঝে, এমন আগ্রহী দর্শকেরও বুঝতে কষ্ট হত ওটা কেমন করে ক্যাচ হয়ে উঠল।

লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন (ক্যাচ তৈরি করে নিতেন)

রবীন্দ্রকন্যা মাধুরীলতার গল্প আর চিঠি—

মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের মেয়ে, এটা একটা পরিচয়। আরেকটি বড়ো পরিচয়, মাধুরীলতা খুব সুন্দর সব গল্প লিখেছেন। 'ওর ক্ষমতা ছিল'—মেয়ের গল্প-লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সম্পূর্ণ যথার্থ মনে হয়, "মাধুরীলতার গল্প" বইটি পড়লে। কী সুন্দর ভাষা, কী সুন্দর বিষয়। আরেকটি সুন্দর বই 'মাধুরীলতার চিঠি'। যেন আরেক রবীন্দ্রনাথকে পাই আমরা, যে-রবীন্দ্রনাথ সংসারী, কন্যার আবদার রাখেন, মেয়েকে উপদেশ দেন বিবাহ পরবর্তী জীবনের জন্য। দুটি বই-ই সম্পাদনা করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাধুরীলতার দুটি বই

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

মাধুরীলতার চিঠি ৫·০০
মাধুরীলতার গল্প ৬·০০

শুধু বনের নয়, ছোটদের মনেরও শিকারী বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব গুহ নিজে দারুণ শিকারী। শিকার-কাহিনী লেখাতেও তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর শিকার নিয়ে লেখার মজা হল, একটি ছোট্ট ছেলের চোখের বিস্ময়, মনের অনুভব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা অদ্ভুত অন্তরঙ্গভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি, বড়োদের গাম্ভীর্য নিয়ে দূর থেকে গল্প বলেন না। সেই ছেলেটির নাম রুদ্র, আর এই ক্ষুদে শিকারী যার সাকরেদ, সেই বড়ো শিকারী হলেন ঋজুদা। এতকাল ঋজুদা আর রুদ্রর নানান গল্পই আমরা শুনেছি, এ-জঙ্গলে, ও-জঙ্গলে, এমন-কি আফ্রিকার গুগুনোগুম্বারের দেশের গল্পও, নতুন বই 'টাঁড় বাঘোয়া'য় বুদ্ধদেব গুহ শোনালেন তাঁর নিজের ছেলেবেলারই এক দুর্দান্ত শিকারকাহিনী। এ-গল্পেরও জবাব নেই।
আর, সব-নতুন 'ঋভুর শ্রাবণ' ? যেন এক নতুন পথের পাঁচালী।

বুদ্ধদেব গুহের বই :

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৮·০০
মউলির রাত ৫·০০
বনবিবির বনে ৭·০০
গুগুনোগুম্বারের দেশে ১০·০০
টাঁড়বাঘোয়া ৮·০০
ঋভুর শ্রাবণ ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গোটা রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যেত তখনই, যখন স্বয়ং লিয়ারি ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন তাঁর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার পদ্ধতিগুলো। তা ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। গতি, ক্ষিপ্রতা, দৃষ্টি, অ্যান্টিসিপেশন সব মিলিয়ে মহৎ প্রতিভার যে ছবি প্রতি মুহূর্তে ফুটে উঠত, বোধহয় অক্ষর সাজিয়ে তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা যায় না।"

একবার এক খেলায় হেনড্রেন ব্যাট করছেন। ব্যক্তিগত রান সংখ্যা ৯৮। প্যাটসি হেনড্রেন মোটেই হেঁজিপেঁজি ব্যাটসম্যান নন। কিন্তু দেখা গেল আটানব্বই রানে পৌঁছে তিনি স্কুল-বালকের মতো নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আসলে নব্বইয়ের ঘরে পৌঁছে যাবার পর সেঞ্চুরি করতে পারবেন কি পারবেন না, এই চিন্তাই তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। তার ফলে খানিকটা নড়বড় করছেন চমৎকার ব্যাটসম্যান প্যাটসি হেনড্রেন। খেলা হচ্ছিল ত্রিনিদাদে। বল দিচ্ছিলেন অ্যাকং। বাঁ-হাতি বোলার, যথেষ্ট চেষ্টা করলেও বল বিশেষ বাঁক নিচ্ছিল না। গালিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনস্ট্যানটাইন। বেশ বুঝতে পারছিলেন, টেনশানে রয়েছেন হেনড্রেন। "হয়, এ রকম হয়,"—লিয়ারি মনে মনে ভাবছিলেন নিশ্চয়ই। ক্রিকেট যাঁরা খেলেন এবং যাঁরা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন কেবল তাঁরা জানেন কী তীব্র অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এই সময়টা। আমিও যে এ-অবস্থায় পড়েছিলাম সে কথা তোমাদের আগে বলেছি। কনস্ট্যানটাইন ভাবলেন, এই সুযোগ। এমন সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে অশেষ দুর্ভোগ আছে প্যাটসি হেনড্রেনের হাতে। ওভার শেষ না হতেই তিনি অ্যাকংকে কাছে ডেকে নিলেন।

"প্যাটসি ঠিক স্বস্তিমতো খেলতে পারছে না, সেটা লক্ষ করেছ?" লিয়ারি ট্রাউজারে বল ঘষতে লাগলেন।

"হ্যাঁ, পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারছে না। এবং এ তো হবেই। নব্বইয়ের ঘরে রয়েছে যে!" কোমরে হাত রেখে বোলার তার মন্তব্য প্রকাশ করল।

"ঠিক তাই। আর আমি এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাই।"

"কী ভাবে?"

"শোনো, স্রেফ অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে গুড লেংথে বল ফেলে যাও। যদি তিলমাত্রও অধৈর্য হয়, জেনো, সেটাই আমাদের সুযোগ তৈরি করে দেবে।" বলে লিয়ারি বল ফেরত দিলেন সতীর্থের হাতে।

অ্যাকং মনে মনে লিয়ারিকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন। কনস্ট্যানটাইনের ক্রিকেট-বুদ্ধির ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। সুতরাং অফ স্টাম্পের বাইরে মাপা লেংথে বল পড়তে লাগল। গালিতে দাঁড়িয়ে কনস্ট্যানটাইন দেখছিলেন, অ্যাকং আবার বল দেওয়া শুরু করার আগে হেনড্রেন চকিতে দেখে নিলেন গালি এবং দ্বিতীয় স্লিপের মাঝখানের বড় ফাঁকটা। অর্থাৎ···সামান্য হেসে লিয়ারি বাঁ দিকে সামান্য চেপে দাঁড়ালেন। যেটা নজর এড়িয়ে গেল হেনড্রেনের। লিয়ারি বুঝতে পেরেছিলেন এই 'গ্যাপ' দিয়ে মারবার তালে রয়েছেন হেনড্রেন।

অফ স্টাম্পের বাইরে বল পড়ল। হে- া শরীর বাঁকিয়ে ব্যাট চালালেন। বিদ্যুৎগতিতে বল ছুটল গালি আর দ্বিতীয় স্লিপের মাঝের ফাঁক দিয়ে। অকস্মাৎ গালি থেকে চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতা নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন কনস্ট্যানটাইন। বাঁ হাত সম্পূর্ণ বাড়ানো, যতটা সম্ভব। পুরো শরীর বাতাসে উড়ে এসে মাটিতে পড়ে চার-পাঁচবার পাক খেয়ে গেল। গড়ানে শরীরটা থামলে দেখা গেল, বাড়ানো বাঁ হাত উঁচু করে তুলে ধরা। মুঠিতে আটকে আছে বল। অবিশ্বাস্য, হেনড্রেন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। ওটার তো বাউণ্ডারিতে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার কথা। কিন্তু তা যে হয়নি, সেটা লিয়ারির বাঁ হাতের মুঠো আর ফিল্ডারদের বিকট চিৎকার শুনে বোঝা যাচ্ছে। তাহলে সেঞ্চুরিটা আর হল না, হেনড্রেন সজোরে মাটিতে ব্যাট ঠুকলেন। তারপর বিস্ময়বিহ্বল ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করলেন তাঁবুর দিকে। যাবার আগে লিয়ারির উদ্দেশে তিনি যে কটি শব্দ ছুঁড়েছিলেন, তা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ভাষা, একেবারে ব্যক্তিগত। অন্যকে বলে শোনাবার মতো নয়।

অনেক পরে, দিনের খেলা শেষ হলে, লিয়ারি কনস্ট্যানটাইনকে পাকড়ালেন একজন সাংবাদিক।

"মশাই, কেমন করে ধরলেন ওটা!"

"কেন, আপনি কি তা দেখেননি?" লিয়ারির মুখে মৃদু হাসি।

"না। বলতে লজ্জা নেই, মাঠে উপস্থিত বহু দর্শকের মতো আমিও ক্যাচ ধরার পুরো পদ্ধতিটা খেয়াল করতে পারিনি। পারা সম্ভব ছিল না। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে ঘটে গেছে তো।"

লিয়ারি বিবরণ দিলেন তাঁর অবিশ্বাস্য ক্যাচের। তাঁর কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিমুগ্ধ সাংবাদিক মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করলেন, এমন ক্যাচ তিনি আগে কখনও দেখেননি। আর কোনোদিন দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ। এ রকমই হয়। জীবনে পাওয়া সেরা মুহূর্তগুলো সত্য না মায়া বুঝে উঠতে বেশ কিছু সময় লাগে। (ক্রমশ)

সারাজীবনে পাহাড়প্রমাণ লিখেছেন এমন ঔপন্যাসিকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ডুমা সম্ভবত সবাইকে ছাড়িয়েছেন। তাঁর রচনাবলী ছাপা হয়েছে মোট বারোশো খণ্ডে।

শমীকের বুদ্ধি

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার বিতস্তা নদীর প্রবল বন্যায় ভেসে গিয়েছে শ্রীনগর এবং তার আশপাশের অনেক গ্রাম। মারা গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। এমনিধারা প্রায় প্রতি বছরই বিতস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রীনগর ; দুর্দশার সীমা থাকে না মানুষের। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু রোধ করা যায়নি এই বন্যা। এর জন্য ব্যয় হয়েছে অজস্র টাকা, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।

বন্যা কেন হয়, তা অবশ্য সবারই জানা। বিতস্তা নদীর দু'পাশে আছে পাহাড়। অনেকদিন ধরে এইসব পাহাড়ের পাথর খসে পড়ে পড়ে নদীর মুখ প্রায় বন্ধ। প্রবল বর্ষায় বৃষ্টির জলে যখন নদী ফুলে ওঠে, তখন সেই জল আর বেরিয়ে যাবার পথ পায় না, ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এক সময় উপচে পড়ে ডুবিয়ে দেয় মাঠ, ঘাট, গ্রাম, শহর।

মহারাজ অবন্তীবর্মা প্রজাদের দুঃখ দেখে খুবই চিন্তিত। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় ব্যস্ত। বন্যা রোধ করার কোনো রাস্তা তাঁদের সামনে নেই, অথচ কিছু তো করতে হবে। কিন্তু কীভাবে, সেটাই তাঁদের আলোচনায় মুখ্য বিষয়। আলোচনা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় একজন প্রহরী এসে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "মহারাজ, এক ব্যক্তি আপনার দর্শনপ্রার্থী।"

মহারাজ অবন্তীবর্মা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা তাকে নিয়ে এসো।"

তাঁর আদেশ অনুযায়ী প্রহরী একটি লোককে নিয়ে এল তাঁর সামনে। লোকটি মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল মন্ত্রণাগৃহের মাঝখানে। লোকটির পরনে ময়লা শতচ্ছিন্ন একটা কাপড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো, বেশ কয়েকদিনের অনাহার আর অনিদ্রার ছাপ তার চোখেমুখে লেগে আছে।

অতি দুঃস্থ চেহারার এই লোকটিকে দেখে মহারাজ প্রশ্ন

করলেন, "তোমার নাম কী ? কী চাই তোমার ?"

লোকটি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার নাম শমীক। আমি বন্যারোধের ব্যাপার নিয়েই কিছু বলতে চাই।"

মন্ত্রী বললেন, "এখন কোনো কথা শোনার সময় আমাদের নেই। দেখছ না আমরা গুরুতর রাজকার্যে ব্যস্ত। তুমি বরং পরে এসো।"

মন্ত্রীকে বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন, "ঠিক আছে, শমীক, তোমার যা বলার আছে বলো, আমি শুনছি।"

লোকটি আগের মতোই মৃদুস্বরে বলতে শুরু করল, "মহারাজ, এবারকার বন্যায় অন্যান্যদের মতন আমারও ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে, স্ত্রীপুত্রেরও কোনো হদিস নেই। জল একটু কমতেই তাই আমি বেরিয়ে পড়েছি, ঘুরে-ঘুরে দেখেছি সব, আর চিন্তা করেছি কীভাবে এই বন্যাকে আটকানো যায়। চিন্তা করতে করতে আজকেই আমি পথ দেখতে পেলাম। হ্যাঁ মহারাজ, এখন আমি বন্যার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারি।"

"কিন্তু কীভাবে ?"

"মহারাজ আমাকে শুধু কয়েকটা মোহরের থলি দিন, আমি বন্যা বন্ধ করে দেব।"

মন্ত্রী তার এই কথা শুনে বললেন, "শমীক, তুমি একটা পাগল ! আমরা হাজার চেষ্টাতেও যা পারিনি, তুমি তাই করবে মাত্র কয়েকটা মোহরের থলি দিয়ে ? কী সব বাজে কথা বলছ ?"

শমীক বলল, "আমি পাগল নই মহারাজ, জোচ্চোরও নই।"

রাজা হাসলেন। বললেন, "সবই বুঝলাম শমীক, কিন্তু মোহরের থলি দিয়ে তুমি কী করে বন্যা আটকাবে ?"

শমীক হাতজোড় করে বলল, "মহারাজ, আপাতত উপায়টার হদিস আমি দেব না। মোহর দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আপনার টাকা তো নানাভাবে নানাদিক দিয়েই খরচ হয়, এটাও নাহয় তেমনভাবেই খরচ হবে। আমার নিজের টাকা থাকলে আমি চাইতাম না।"

মহারাজ অবন্তীবর্মা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "বেশ, আমি তোমাকে মোহর দেব, কিন্তু বন্যা রোধ না করতে পারলে....."

"যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।"

"কবে নাগাদ তোমার চাই ?"

"এখন নয় মহারাজ, বন্যার জল সবেমাত্র নামতে শুরু করেছে, পুরোপুরি নেমে গেলে আমি আবার আসব, আর তখনই নিয়ে যাব থলিগুলো।"

কয়েকদিনের মধ্যেই বন্যার জল পুরোপুরি নেমে গেল। দেখা দিল খাদ্যাভাব, মহামারী। দেশ হয়ে গেল শ্মশান। বাতাস ভারী হয়ে উঠল কান্নার শব্দে।

ঠিক তখনই শমীক ঘুরে বেড়াতে থাকল বন্যাবিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে। সবাইকে সে বলতে থাকল, "বিতস্তা নদীর তীরে যেখানে পাথর আছে, সেখানে যাও, মুঠো মুঠো মোহর পাবে।" খিদের জ্বালায়, প্রিয়জন, বাড়িঘর হারানোর বেদনায় অবসন্ন, ক্লান্ত মানুষের দল এসে ভিড় করতে থাকল বিতস্তার তীরে। ক্রমে যখন অজস্র মানুষের ভিড় জমল বিতস্তা নদীর তীরে, তখন একদিন শমীক হাতে কয়েকটা মোহরের থলি নিয়ে এসে দাঁড়াল একটা পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকেই সে চিৎকার করে বলল, "তোমরা যারা এখানে এসেছ, তারা শোনো, আমি মোহর ছড়িয়ে দিচ্ছি বিতস্তার জলে, তোমরা তুলে নাও। তবে একটা কথা....."

হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, "বলো, শুনব।"

শমীক আবার চিৎকার করে বলল, "জলে যে-সব পাথর রয়েছে, সবাই একখানা করে তা তীরে তুলে রাখো। যে রাখবে, সেই পাবে মোহর কুড়িয়ে নেবার অধিকার।"

তার কথা শেষ হবার আগেই হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়ল নদীর জলে, লক্ষ লক্ষ হাত ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাথর তোলার কাজে। শমীক পাহাড়ের উপর থেকে মুঠো মুঠো মোহর ছড়িয়ে দিতে থাকল জমে-থাকা পাথরগুলোর উপর। একদিনেই সব পাথর উঠে গেল। পাথরের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে বিতস্তার জলস্রোত উত্তাল হয়ে বয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

মহারাজের কাছে খবর গেল। তিনি নিজে এলেন নদীর ধারে। ততক্ষণে কাজ শেষ, জনতা ঘরে ফেরার পথে। আর নদীর জলধারা অবিরল বয়ে চলেছে।

মহারাজ অবন্তীবর্মা শমীককে ডাকলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "শমীক, তোমার বুদ্ধিই দেশকে বাঁচাল।"

প্রচণ্ড আনন্দে কেঁদে ফেলল শমীক। বলল, "মহারাজ, আমিও পরিতৃপ্ত। তবে এ-সবের পিছনে আমার কৃতিত্বের চেয়েও বড় কৃতিত্ব এই জনতার উদ্যম, শক্তি আর ঐক্যের।"

কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'র একটি কাহিনী অবলম্বনে

ছবি : অনুপ রায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব তৈ তৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

সদাশিব চুপ করে থাকে।

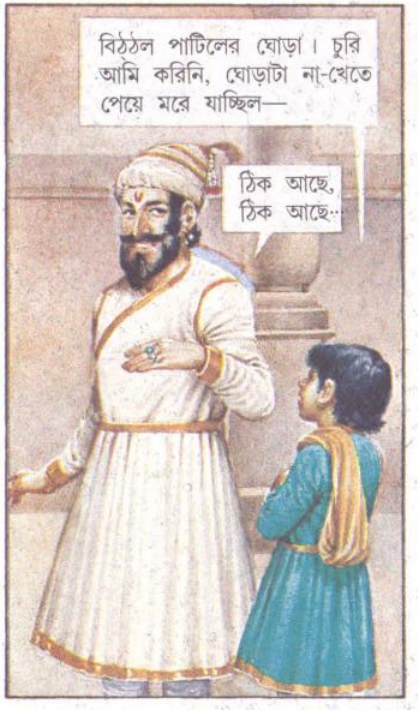

শিবাজির কথামতো সদাশিব চলে যায় ঘোড়াশালায়। কালো রঙের ছিপছিপে একটা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে আসে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টিনার দুঃখ

আমাদের পাড়ায় সোনালি বলে একটি মেয়ে ছিল। তার ছিল খুব সুন্দর একটা পুতুল। সে পুতুলটার নাম দিয়েছিল টিনা। টিনা খুব ভাল মেয়ে। শুইয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়ে। খেতে বললেই খায়। সোনালি ও তার বোন রুপালি রোজ তাদের পুতুলটাকে খাওয়াত, ঘুম পাড়াত, সাজাত ও তার সঙ্গে খেলা করত।

এখন সোনালি ও তার বোন রুপালি বড় হয়ে গেছে। স্কুলে যায়, নাচে, গান গায়, আঁকা শেখে। তাই আর টিনার সঙ্গে খেলা করার সময় পায় না। টিনাকে এখন একটা আলমারির ভেতরে রেখে দিয়েছে তারা। তাই টিনার এখন খুব দুঃখ।

উজ্জয়িনী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

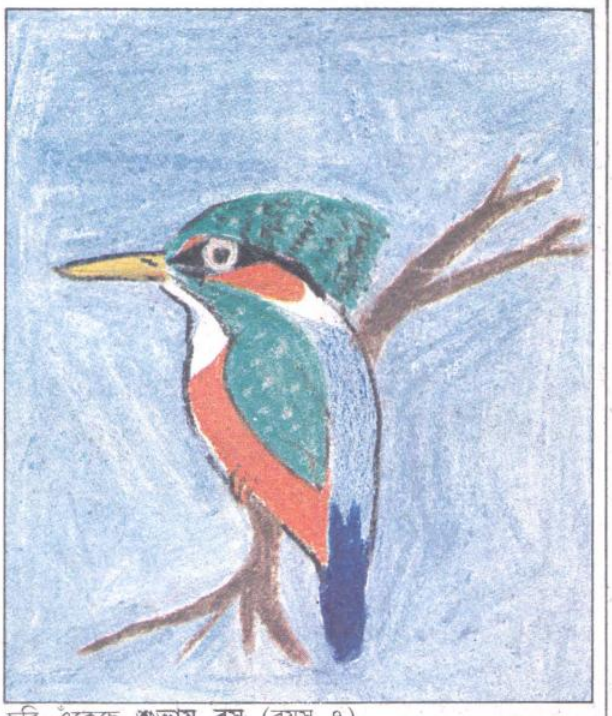

ছবি এঁকেছে **শুভায়ু বসু** (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে **পিয়ালি মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৭)

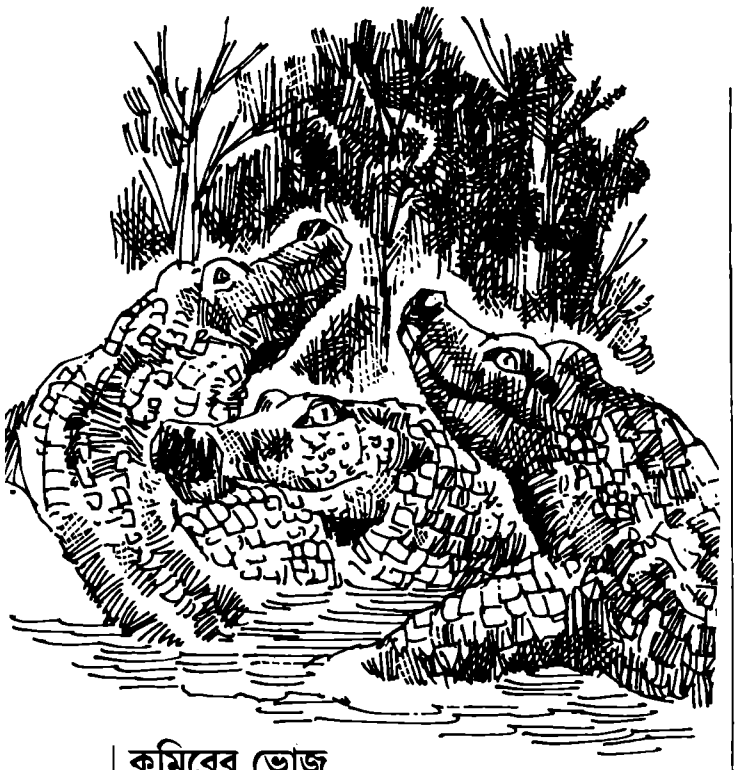

কুমিরের ভোজ

চিড়িয়াখানায় কুমির দেখেছি। কুমিরগুলো চুপচাপ শুয়ে থাকে। এবারে মাদ্রাজে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে এক জায়গায় কুমির দেখলুম। তারা কিন্তু নড়াচড়া করে, ঘুরে বেড়ায়। মহাবলীপুরম দেখে মাদ্রাজ শহরে ফিরছিলুম। রাস্তায় এক জায়গায় একটা সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ছিল 'কুমির ব্যাঙ্ক'।

সেখানে নানা ঘেরা জায়গায় অনেক কুমির ছিল। বাচ্চা কুমির দেখলুম, আবার একটা জলা জায়গায় বেশ কয়েকটা বড়-বড় কুমির দেখলুম। পাড়ে বালির নীচে কুমিরের ডিম আছে বলে লেখা ছিল। আর একটা মজার জিনিস দেখলুম। ওখানকার একটা লোক বাচ্চা কুমিরগুলোকে খাবার খাওয়াতে এল। বালতির মধ্যে ছিল বেশ বড়-বড় মরা মেঠো ইঁদুর।

একটা ইঁদুর নিয়ে ঝুলিয়ে দিতে একটা বাচ্চা কুমির জল থেকে উঠে এল, আর তার হাত থেকে ইঁদুরটা কেড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কুমির এসে প্রথম কুমিরটার মুখ থেকে সেই ইঁদুরটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। তারপর দুজনে মিলে ঝটাপটি করল। আর তারা পাক খেতে লাগল। যেমন করে আমরা গামছা নিঙড়োই।

দেখতে-দেখতে ইঁদুরটা দু-টুকরো হয়ে গেল। দুজনে মুখে করে আধখানা ইঁদুর নিয়ে পালাল। এই সময় আর একটা বাচ্চা কুমির এসে একজনের কাছ থেকে খামচে খানিকটা ইঁদুর নিয়ে নিল। তারপর ওই তিনটে কুমির মুখে করে ইঁদুরের টুকরো নিয়ে জলে নেমে গেল।

ওখানে আরও অনেক বাচ্চা কুমির ছিল। তারা কিন্তু ইঁদুর খেতে এল না। ঐ তিনটে কুমিরের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছিল।

দেবাশিস দাস (বয়স ৭)

সাত-দশে

সাত-দশে কত রে ?
তাড়াতাড়ি ক' তো রে—
সাত-দশে সত্তর
সবাই জানে উত্তর।

মহাশ্বেতা চক্রবর্তী (বয়স ১০)

ভাই রে

বেড়ালের শিং হবে
কুকুরের পটকা
ভাই রে
খরগোশ একা মুখে
দেবে ডানা ঝটকা
ভাই রে
হিলহিলে ফণা নিয়ে
ঝুটা নয় সাচ্চা
ভাই রে
বাগান পাহারা দেবে
ব্যাঙেদের বাচ্চা
ভাই রে
পুকুরে আগুন জ্বেলে
উড়ে যাবে কোটিদুই
ভাই রে
ছটফটে মৌরলা
বয়স্ক পোনা রুই
ভাই রে
ঘুরে ঘুরে ঘাস খাবে
কাকাতুয়া ময়না
ভাই রে
গরুগুলো উড়ে যাবে
ঘরে মন সয় না
ভাই রে
চোত-ফাগুনের ভোরে
গান ধরে দেবে ডাক
ভাই রে
ময়ূরপুচ্ছধারী
কেলোকুলো দাঁড়কাক
ভাই রে

সন্দীপ মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

পশুরাও পশু পোষে

চঞ্চল পাল

পশুদের মগজে বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম তাই আমরা তাদের পোষ মানিয়ে অনেক কাজ আদায় করে নিই। গোরুর কাছ থেকে দুধ আদায় করি, বেড়ালকে দিয়ে ইঁদুর মারাই, কুকুরকে দিয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়াই, ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়াই, এমনকী বাঘ-ভাল্লুককে দিয়ে সার্কাসের খেলাও দেখিয়ে থাকি আমরা।

কিন্তু, এক পশু আর এক পশুকে পোষ মানাচ্ছে—এ-কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে না ? প্রকৃতির খেয়াল কিন্তু এমনই যে, এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে কে যে কাকে পোষ মানাচ্ছে সেটা বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ে। ভালভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে দুটো ভিন্ন জাতের প্রাণী এমনই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে, একজনের আর একজনকে না হলে যেন চলে না। আসলে, এই হাত মেলানোর সুবাদে দুটো পশুই সমানভাবে উপকৃত হয়। প্রমাণ পেতে গেলে চলো প্রথমে পোকামাকড়ের রাজ্যে একটু ঘুরে আসি।

'অ্যাফাইড্' নামের কয়েক ধরনের পোকা আছে যারা ঝাঁকে-ঝাঁকে চারা গাছে চড়াও হয়। কিন্তু পাতা বা ডালের ওপর বসে তারা আর নড়তে-চড়তে পারে না। মনে হয়, গাছের আঠায় তাদের পা আটকে গেছে। আসলে, প্রতিটি পোকার দুটো ফাঁপা ও লম্বা শুঁড় আছে। এই শুঁড় গাছের ডালে বা পাতায় বিঁধিয়ে দিয়ে তারা গাছের রস চুকচুক করে টানতে থাকে। কিন্তু এমনই কপাল যে, এই রসের খুব সামান্যই তাদের হজম হয়, বেশির ভাগ রস শরীর থেকে বেরিয়ে আসে পেছনের পায়ের ডগা দিয়ে। বেরিয়ে-আসা এই রসে চিনির ভাগ এত বেশি যে, তা খুবই আঠালো হয়ে পড়ে। ফলে এই আঠালো রসে পোকাগুলো নিজেরাই আটকে পড়ে গাছের গায়ে।

ঘটনাটা কিন্তু তাদের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মিষ্টি রসের সন্ধান পেয়ে লাল পিঁপড়েরা দল বেঁধে আসতে থাকে। পিঁপড়েরা শুধু রস খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, পোকাগুলোকে মুখে করে গাছের তাজা অংশে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাই পোকাগুলো দ্বিগুণ উৎসাহে গাছের তাজা রস টানতে থাকে আর আখেরে লাভ হয় পিঁপড়েগুলোর।। শুধু তাই নয়, পিঁপড়েগুলো এইসব পোকাদের ধরেও নিয়ে যায় মাটির নীচের বাসায়। এই বাসাগুলো তৈরি হয় কোনো গাছের কচি শেকড়ের চারপাশে। পোকাগুলো এইসব শেকড়ের রসভক্ষণ ও রস বিতরণ অবাধে চালিয়ে যায়।

পোকাগুলো কিন্তু বোকা নয়। এতে তাদেরও লাভ হয়। তাদের নড়াচড়ার সুবিধে হয়। তারা আবার প্রায়ই খোলস ছাড়ে। এই খোলস পোকার দেহে যদি রসে লেপটে থাকে তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বেজে যাবে, কিন্তু পিঁপড়েরা এইসব খোলস পরিষ্কার করে দেয়। সবচেয়ে বড় লাভ এই যে, পোকাগুলো ডিম পাড়লেই পিঁপড়েরা সেগুলো বাসার ভেতর নিয়ে যায়, আর নিজেদের ডিমের মতোই যত্ন করে। তা না হলে পাখি বা অন্য কীটপতঙ্গরা এই ডিম সাবাড় করে দিত। তাই দেখা গেছে যে, পিঁপড়ে না থাকলে এইসব পোকার বংশবৃদ্ধি হতে খুবই দেরি হয়।

শুধু কীটপতঙ্গই নয়, বড় মাপের পশুপাখিরাও এ-ব্যাপারে কম যায় না। মিশরের নীল নদের তীরে প্রচুর কুমির দেখতে পাওয়া যায়। 'ইজিপশিয়ান প্লোভার্' নামের একরকম পাখি এই কুমিরগুলোর পেছনে সবসময় ঘুর-ঘুর করে। তীরে উঠে কুমির যখন হাঁ করে রোদ পোহায় তখন এই পাখিগুলো কুমিরের মুখের ভেতর ঢুকে গিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। আসলে কুমিরের দাঁতে যে পোকা হয় তা নাকি এই পাখিদের খুব প্রিয় খাবার। এতে কুমিরের দাঁতও পরিষ্কার হয় আবার পাখিগুলোর ঠোকরানোর ফলে একটা শিরশিরে আরাম অনুভব করে, ফলে কুমিরের বিশ্রামের মেজাজটা আরও বেড়ে যায়।

কুমির যদি খপ করে মুখটা বন্ধ করে ফেলে তাহলে অনায়াসে দু-চারটে পাখি খেয়ে নিতে পারে, কিন্তু এ-কাজ তারা কখনও করে না। তাহলে কি বলতে হবে যে, পশুদেরও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে ? প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পশুদের প্রকৃতিই হচ্ছে এমন যে, খিদে পেলে তারা কখনও বিশ্রাম করবে না। আবার বিশ্রাম করার সময় তাদের একটুও খিদে থাকে না। তাই রোদ পোহানোর সময় কুমিরের কাছে খিদের চেয়ে সুড়সুড়ির মেজাজটাই বড়।

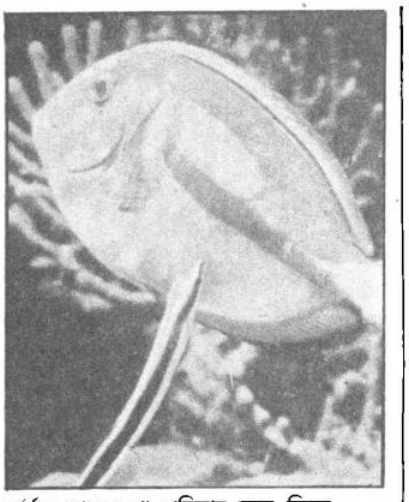

সার্জন মাছের গা পরিষ্কার করে দিচ্ছে বার্বার মাছ

তাছাড়া, পাখিগুলো আর একটা উপকারও করে। কুমিরের কোনো শত্রুকে আসতে দেখলে এরা অনেক উঁচু থেকে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, এমনকী কুমিরের মাথায় চাঁটি মারার ভঙ্গিতে ঝাপটাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমিরগুলো সতর্ক হয়ে জলে নেমে যায়। আফ্রিকার জঙ্গলেও কুমির ও পাখির এই বন্ধুত্ব দেখা গেছে, অবশ্য সেখানে পাখির নাম 'ট্রোকিলাস্'।

দক্ষিণ মেরুর বরফে-ঢাকা মহাদেশের চারপাশের সমুদ্র হচ্ছে 'স্পার্ম হোয়েল' নামক তিমিমাছের স্বর্গরাজ্য।

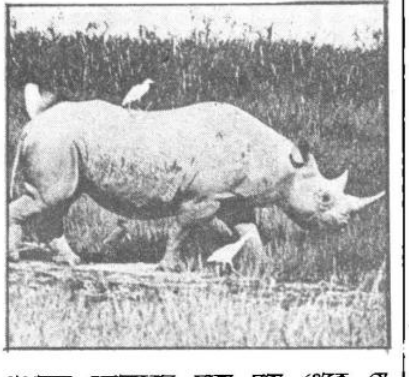

গণ্ডারের চলাফেরার সময় ঘাস থেকে যে পোকা ওড়ে, সেই পোকা ধরতে গণ্ডারের সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছে ক্যাটল 'এগরেট' পাখি

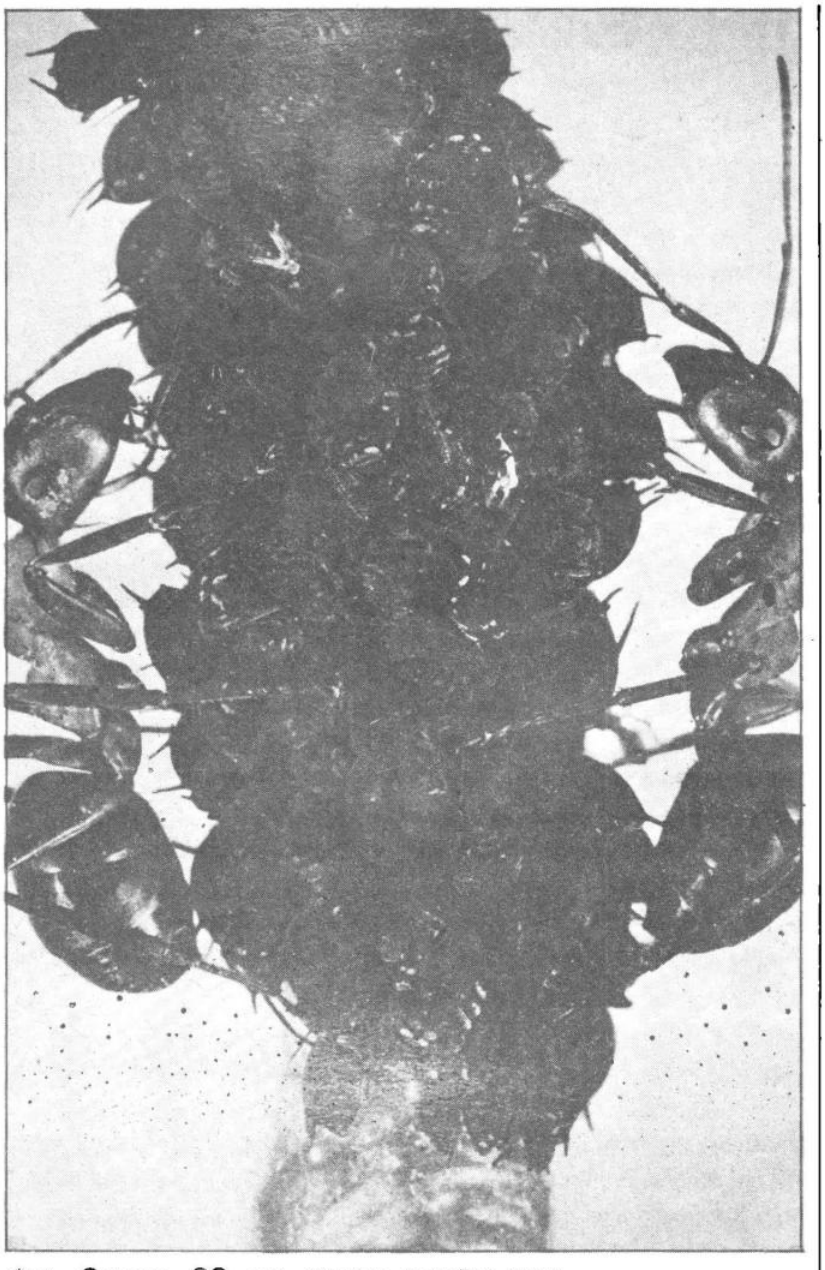

ডেঁয়ো পিঁপড়েকে মিষ্টি রস খাওয়াচ্ছে 'অ্যাফাইড' পোকা

তবে শরৎকাল এসে গেলেই সমুদ্রজল বরফে পরিণত হতে শুরু করে, আর তখন তিমিমাছগুলো দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের দিকে সরে আসে। গরমকালে তিমির গায়ে পোকা ও শ্যাওলা জাতীয় আবর্জনা জমে। সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য তিমিমাছগুলো 'গ্রে ফ্যারালোপ্' নামক সামুদ্রিক পাখিকে লোভ দেখায়।

পাখিগুলোও এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ফলে এইসময় সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিমিমাছ জলের ওপর পিঠ তুলে ভাসছে, আর কতকগুলো পাখি তার পিঠের ওপর বসে আছে। বুঝতেই পারছ যে, কুমির ও পাখির বন্ধুত্বের যে কারণটা আগে বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও তাই হয়।

কাঠঠোকরা পাখির নাম কে না জানে, কিন্তু ষাঁড়ঠোকরা পাখির নাম শুনেছ? আফ্রিকার একটা পাখির ইংরেজি নাম 'অক্সপেকার', এটি বাংলা করলে 'ষাঁড়ঠোকরা' হতে পারে। এদের পায়ের আঙুলের জোর এত বেশি যে জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায় জোঁকের মতো আটকে থাকতে পারে। আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে মোষ, বাইসন বা হরিণ দুলকি চালে ঘাস খাচ্ছে আর এইসব পাখি তাদের পিঠ, ঘাড়, পেট, লেজ ধরে দোল খাচ্ছে। ব্যালান্স রাখার কাজে পাখিগুলোর লম্বা লেজও খুব সাহায্য করে। আসলে, অক্সপেকারের কাজ হল বাইসন বা হরিণ জাতীয় জন্তুর চামড়া থেকে পোকামাকড় খুঁটে খাওয়া, আর বিপদের গন্ধ পেলে তুমুল হৈ-চৈ করা। তাই বাইসন বা হরিণও এদের লাই দিয়ে মাথায় তুলে রাখে।

'ক্যাটল-এগ্রেট্স' পাখির ব্যবহারও অনেকটা অক্সপেকারের মতোই, তবে এরা গোরু-মোষের গায়ে বড় একটা চড়ে না, ঠোক্করও মারে না, বরং এরা গোরু-মোষের পাশাপাশি হাঁটে আর মাঝে-মাঝে ঘাসে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। আসলে, এইসব পাখির প্রিয় খাদ্য একরকম উড়ন্ত কীট বা পোকা। বেশিরভাগ সময় এইসব পোকা ঘাসের ওপরেই বসে থাকে। যেই ঘাসখেকো জন্তুরা ঘাসের ওপর হাঁটতে শুরু করে অমনি ঘাসে আলোড়ন শুরু হয় আর পোকাগুলো ভয়ে উড়তে থাকে। এই অবস্থায় পাখিগুলো কাছাকাছি থেকে কম খাটুনিতে ভালই শিকার ধরতে পারে। এরা কাকের মতো এতই সতর্ক পাখি যে, কাছাকাছি বাঘ যদি ওত পেতে থাকে তাহলে এরা ঠিক বুঝত পারবে আর চেঁচামেচি শুরু করবে। গোরু, মোষ বা বাইসনের এটাই মস্ত লাভ।

এবার এসো একটু জলের তলায় ডুব দেওয়া যাক। বহুকাল ধরে মেক্সিকোর জেলেরা একধরনের মাছের কথা বলে আসছেন। তাঁরা এইসব মাছের নাম দিয়েছেন 'বার্বার ফিশ'।

এইসব মাছ আকারে বেশ ছোট, কিন্তু অনেক বড় বড় মাছের গায়ে তারা চিমটি কাটে। বড় মাছেরা অন্যান্য ছোট মাছকে অনেকসময় খেয়ে ফেলে, কিন্তু এই মাছের গায়ে কখনও 'হাত দেয় না'। কারণ, বড় মাছের গা পরিষ্কার করা আর সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য বার্বার ফিশের দরকার। বড় মাছের গায়ে বিশেষ করে কানকো ও ফুলকোর মধ্যে রোজই অনেক ময়লা, শ্যাওলা ও ক্ষতিকারক জীবাণু জমা হয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে, একটা বড় মাছ জলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, আর

বার্বার ফিশ তার ফুলকোর ভেতর ঢুকে কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন কোনো নাপিত চুলে কাঁচি চালাচ্ছে। যেসব শ্যাওলা আর জীবাণু ফুলকোর ভেতর ঢুকে থাকে তা খাওয়াতেই নাপিত-মাছের আনন্দ!

সব সময় বার্বার ফিশই যে বড় মাছের খোঁজ করে তা নয়, বরং অনেকসময় দেখা যায় যে, বড় মাছেরাই নাপিত-মাছের সেলুনে চলে এসেছে। কয়েক ধরনের বার্বার ফিশ কখনও বড় মাছকে খোশামোদ করে না; এরা কয়েক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও স্পঞ্জের ওপর বসে থাকে এবং এদের গায়ের রঙ এতই উজ্জ্বল যে, বড় মাছগুলো এদের দূর থেকে চিনতে পারে আর কাছে চলে আসে। শুধু তাই নয়, একপাশের কানকো পরিষ্কার হয়ে গেলে ঘুরে দাঁড়ায়, যাতে অন্যপাশটা এই মাছ পরিষ্কার করে দিতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, অনেক সময় গা পরিষ্কার করাতে বড় মাছের লাইন পড়ে যায়, এবং যতক্ষণ না একটা বড় মাছের গা পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ পেছনের বড় মাছগুলো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

ফ্লোরিডার উপকূলে একটা খাড়ির মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে,যে-সব বড় মাছ খাড়ির মধ্যে আসতে চায় না তারাও খাড়ির ভেতরে চলে আসে যদি খাড়িতে বার্বার ফিশ ছেড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য যে-কোনো বড় মাছের সঙ্গে এই মাছের বন্ধুত্ব হয় না, বিশেষ-বিশেষ বড় মাছের সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ বার্বার ফিশের ঘনিষ্ঠতা হয়। ক্রমশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে, হাঙরও অনেকসময় এই মাছের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঘোরাফেরা করে, এমনকী জলহস্তী জলের ওপর মাথা তোলার সময় দেখা যায় যে, তার বিরাট দেহকে কামড়ে কয়েকটা বার্বার ফিশ ঝুলে রয়েছে।

তবে কাঁকড়াও এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। এক একটা 'রেক ফিশ' বা'পাইলট ফিশ' দিনে সাত-আটবার 'হারমিট্ ক্র্যাব' নামক কাঁকড়ার সেলুনে এসে কানকো পরিষ্কার করায়। আবার গ্যালাপাগোস্ দ্বীপপুঞ্জে 'ইগুয়ানা' নামক গিরগিটি যখন সমুদ্রতীরে রোদ পোহায় তখন 'রক্ ক্র্যাব' জাতের কাঁকড়া তাদের গায়ে মাথায় ঘুরে ঘুরে শ্যাওলা ও জীবাণু পরিষ্কার করে দেয়।

অনেকসময় দেখা যায়, দুটো আলাদা প্রাণীর প্রিয় খাদ্য একই, কিন্তু কোনো একজনের ক্ষমতায় কুলোয় না সেই খাবারকে বাগে আনতে। সে ক্ষেত্রে একটু অন্যভাবে এই দুজনের মধ্যে ভাব জমে ওঠে। অনেকটা ভোঁদড়ের মতো মুখ আর কুকুরের মতো দেহ নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে যে জন্তু তার ইংরেজি নাম 'র‍্যাটল'। এরা মধু খেতে পেলে আর কিছু চায় না। মৌচাক দেখতে পেলেই হল, ভেঙেচুরে তছনছ করে ছাড়বে। এদের গা এতই লোমশ যে মৌমাছিরা গায়ে হুল ফোটাতে পারে না। এক জাতের পাখি আছে যারা তক্কে-তক্কে থাকে, কোথায় র‍্যাটলের দেখা পাওয়া যায়। কারণ, পাখিগুলোর প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মৌচাকের ভেতরের মোমের মতো অংশটা। কিন্তু মৌমাছির চাক ভাঙার ক্ষমতা এদের নেই। তাই একটা র‍্যাটলের দেখা পেলে এরা কর্কশ গলায় ডাকতে থাকে আর গাছের ডালে লাফালাফি শুরু করে দেয়। র‍্যাটলও বুঝতে পারে যে, পাখিগুলোর সন্ধানে নিশ্চয়ই কোনো মৌচাক আছে। তারপর পাখিগুলো মৌচাকের দিকে আস্তে আস্তে উড়ে যায় আর র‍্যাটল্ও পাখিগুলোকে অনুসরণ করে ছুটতে থাকে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পাখিগুলো যেন র‍্যাটলের গাইড্, তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'হনিগাইড্'।

সমুদ্রের তলায়ও এ ধরনের আর একটা মজার বন্ধুত্বের খবর পাওয়া গেছে। অনেকটা কেঁচোর মতো দেখতে একটা কীটের নাম 'র‍্যাগওয়ার্ম'। এরা শামুকের ভেতরের নরম অংশটা খাবার জন্য ছুঁকছুঁক করে, কিন্তু এরা কাছে এলেই অতি সাবধানী শামুকের মুখ খোলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অথচ 'ডগ্‌ফিশ' মাছ এতই চালাক যে শামুকের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে আর শামুক মুখ বার করলেই এক ঝটকায় মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে দেয়। তখন র‍্যাগওয়ার্ম শামুকের ভেতরকার নরম অংশটা কুরে-কুরে খেতে খেতে একেবারে সাফ করে দেয়। ডগফিশ আর র‍্যাগওয়ার্মের কাজ শেষ হলেই এগিয়ে আসে আর একটা জীব—'হার্‌মিট্ ক্র্যাব্' গোষ্ঠীর কাঁকড়া। এরা শামুকের খোলার ভেতরটা দখল করে নেয়। কারণ, তাদের কাছে ডিম পাড়ার আর লুকিয়ে থাকার এত ভাল জায়গা আর নেই। তাই সমুদ্রের নীচে এই তিনটে প্রাণীকে প্রায়ই কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং বুঝতেই পারছ যে, শুধু মানুষই নয়, পশুরাও পশু পোষে। তবে আমাদের সঙ্গে পশুদের সম্পর্ক নেহাতই মনিব-চাকরের, আর পশুদের বেলায় এই সম্পর্ক বন্ধুত্বের, এই যা তফাত! আমরা পোষা জীবদের সব সময় বন্দী করে বা আগলে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু পশুজগতে একদল অন্যদলের ওপর নির্ভর করেও পুরোপুরি স্বাধীন; তাই উদারতার দিক দিয়ে হয়তো পশুদের কাছে আমরা হেরে গেছি!

একদিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর পৌত্রকে নিয়ে ভলটেয়ারের কাছে এলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন পৌত্রকে আশীর্বাদ করার জন্য। বৃদ্ধ ভলটেয়ার তাঁর দুর্বল হাতটি যুবকের মাথায় রেখে বললেন, ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো।

এডগার অ্যালেন পো তাঁর বিখ্যাত রচনা 'দি র‍্যাভেন' বিক্রি করেছিলেন মাত্র দশ ডলারে। কিন্তু ওই বইয়েরই পাণ্ডুলিপি পরে বিক্রি হয়েছিল দশ হাজার ডলারে।

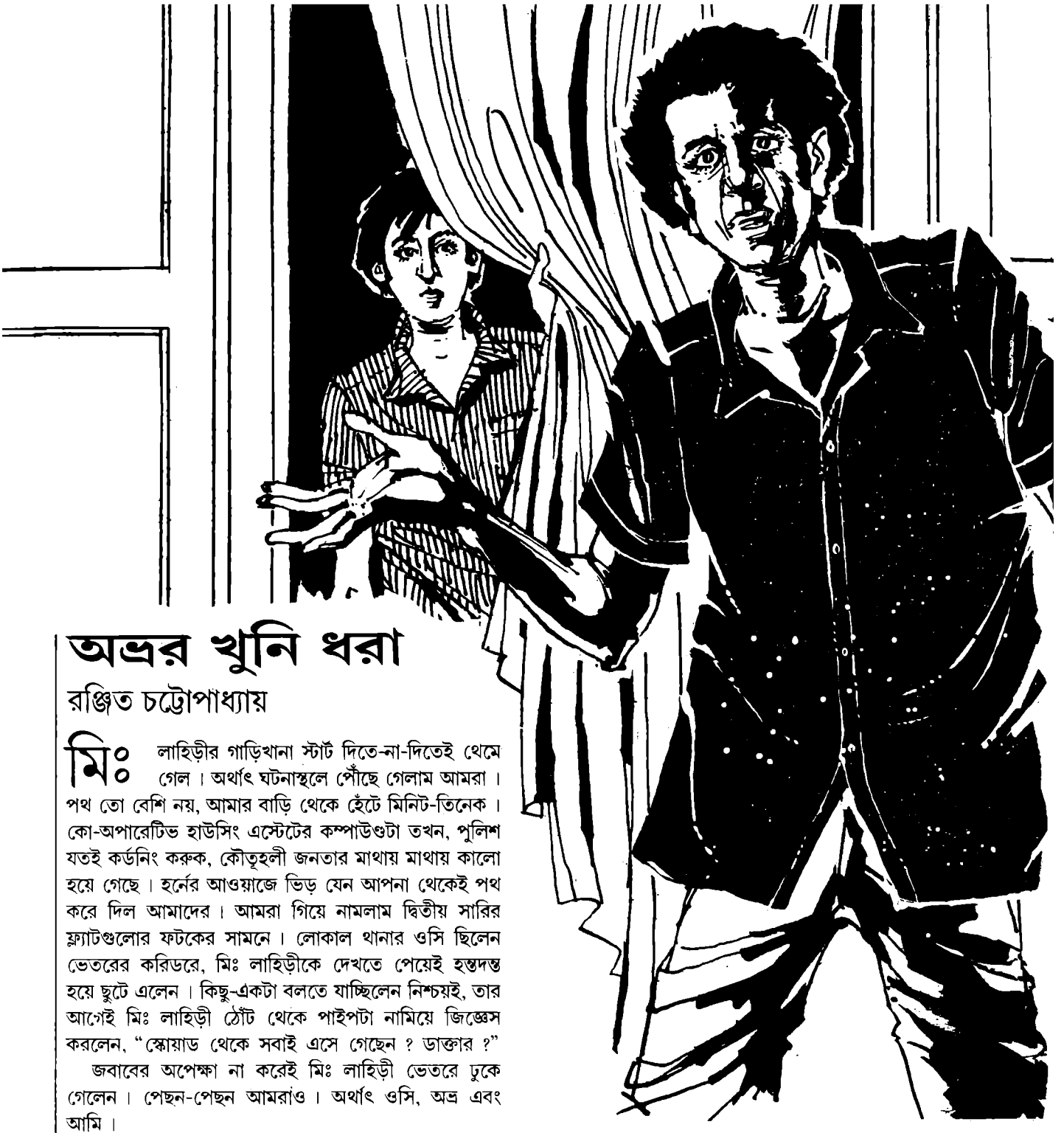

অভ্রর খুনি ধরা

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

মিঃ লাহিড়ীর গাড়িখানা স্টার্ট দিতে-না-দিতেই থেমে গেল। অর্থাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলাম আমরা। পথ তো বেশি নয়, আমার বাড়ি থেকে হেঁটে মিনিট-তিনেক। কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেটের কম্পাউণ্ডটা তখন, পুলিশ যতই কর্ডনিং করুক, কৌতূহলী জনতার মাথায় মাথায় কালো হয়ে গেছে। হর্নের আওয়াজে ভিড় যেন আপনা থেকেই পথ করে দিল আমাদের। আমরা গিয়ে নামলাম দ্বিতীয় সারির ফ্ল্যাটগুলোর ফটকের সামনে। লোকাল থানার ওসি ছিলেন ভেতরের করিডরে, মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন নিশ্চয়ই, তার আগেই মিঃ লাহিড়ী ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "স্কোয়াড থেকে সবাই এসে গেছেন ? ডাক্তার ?"

জবাবের অপেক্ষা না করেই মিঃ লাহিড়ী ভেতরে ঢুকে গেলেন। পেছন-পেছন আমরাও। অর্থাৎ ওসি, অভ্র এবং আমি।

ঘটনাটা ঘটেছে একতলায়। কোলাপসিবল গেটঅলা ডানদিকের ফ্ল্যাটখানার বাঁ-দিকের সামনের ঘরটাতেই। ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল, চারদিকে একটা থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঝের ওপর রক্তমাখা চাদরে ঢাকা একটা নিশ্চল শরীর। শুধু নিশ্চল নয়, নিস্পন্দও বটে। কালচে রক্তের একটা ধারা মেঝের ওপর গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে। বিছানার চাদর-বালিশ দোমড়ানো-মোচড়ানো, টেবিলের ড্রয়ার আধটানা অবস্থায় ঝুলছে, স্টিলের আলমারির পাল্লাদুটো হাট করে খোলা। কাপড়চোপড় অগোছালো, কিছু-বা মেঝেয় ছড়ানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বড় রকমের একটা ঝোড়ো-তল্লাশি যেন সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে ঘরখানার।

ঘরের চারদিকে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে মৃতদেহের পাশে চোখ রাখতেই নজর পড়ল বছর-তিরিশ বয়সের একটি শক্তসমর্থ যুবার দিকে। মুখখানা শুকিয়ে কাঠ, চোখজোড়ায় শূন্য, বিষণ্ণ দৃষ্টি। ডাঃ সান্যাল তার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম যতীন হাজরা। সম্পর্কে মৃতের পাড়াতুতো এক ভাগনে। ওর বাড়ি হুগলির জনাই রোডে। নিহত রণদা ঘোষালেরও বাড়ি ওখানে। রণদা ঘোষাল বড়বাজারের এক বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসাদার। লাখ-লাখ টাকার কারবার। ওই

কারবারের দৌলতেই দেশের দিকে জমিজমা বাগান-বাগিচা যেমন করেছেন প্রচুর, তেমনি কলকাতাতেও খান-দুয়েক বাড়ি আর সম্প্রতি কো-অপারেটিভের এই ফ্ল্যাটটিও কিনেছিলেন তিনি। ইদানীং ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করাটা ঠিক ধাতে সইছে না, তাই এই ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন তিনি ছেলে-বউ নিয়ে বাস করবেন বলে। ছেলেটা এখনও খুব ছোট, স্কুলে পড়ে। ভাগনে যতীনকে বড় ভালবাসতেন তিনি। গরিবের ছেলে, লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি, অথচ মাথাটা খুব ভাল। তাই নিজের ব্যবসায় তাকে টেনে নিয়েছিলেন, ছেলের মতো স্নেহ করতেন। হয়তো এমন সম্ভাবনাও ছিল, ভবিষ্যতে একদিন তাকে ব্যবসার একজন অংশীদার করে নেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যতীনের, তার আগেই ঈশ্বর তাঁর সাধে বাদ সাধলেন।

মিঃ লাহিড়ী সব শুনলেন, চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরের কোনো জিনিস স্পর্শ করা হয়েছে কি ?"

একচোখ জল নিয়ে জবাবটা যতীন হাজরাই দিল। বলল, "না, ঘরের কোনো জিনিসই আমি ছুঁইনি। শুধু মামার এই বীভৎস মুখখানা সহ্য করতে পারিনি বলে বিছানার চাদরখানা তুলে নিয়ে ওঁর দেহটা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি।"

মিঃ লাহিড়ীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাঃ সান্যাল মৃতের দেহ থেকে আস্তে আস্তে চাদরখানা সরিয়ে নিতেই যেন চমকে উঠলেন। কী বীভৎস দৃশ্য! আধুনিক কেতায় সাজানো-গোছানো ঘরখানার মেঝের ওপর যেন আদিম একটা বর্বরতা নিষ্ঠুর উল্লাস নিয়ে হাসছে। সাধারণ দোকানদারের পোশাক পরনে ভারী চেহারার রণদা ঘোষালের শরীরটা নিশ্চল নিথর অবস্থায় পড়ে আছে খাটের ঠিক সামনেই। ভারী কিছুর আঘাতে সারা মুখখানা থেঁতলানো কাদার মতো হয়ে গেছে। শরীরে 'রিগার মর্টিস' শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই।

মৃতদেহ থেকে চোখদুটো আমার সরে গেল অভ্রর দিকে। নিষ্পলক চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে মৃতের দেহের ওপর। কে জানে কী ভাবছে, মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে!

মিঃ লাহিড়ী একবার আমার দিকে তাকালেন, একবার অভ্রর দিকে। তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কখন ঘটেছে বলে আপনার মনে হয় ?"

সঙ্গে-আনা একটা পলিথিনের ব্যাগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্তমাখা চাদরখানা ভরে নিতে নিতে ডাঃ সান্যাল বললেন, "ঘণ্টা সাত-আট আগে ঘটেছে বলেই মনে হয়।"

ইশারায় যতীন হাজরাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন মিঃ লাহিড়ী। সেই সঙ্গে আমাদেরও। বীভৎস-দর্শন

মৃতদেহের কাছ থেকে বোধহয় আমাদের সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

পাশের ঘরে সোফার ওপর সবাই বসলে, মিঃ লাহিড়ী যতীন হাজরাকে প্রশ্ন করলেন, "মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করলেন কে ? ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল বলুন তো মিস্টার হাজরা ?"

কান্না সামলাতেই বোধহয় যতীন হাজরা একটু সময় নিল। তারপর বলল, "মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করি আমিই। সকাল ন-টা নাগাদ বড়বাজারের গদিতে বেশির ভাগ দিনই আমরা দুজন— মামা আর আমি একসঙ্গে যাই। কিন্তু আজ আর তা হয়নি। সকালে মামা বসেছিলেন তাঁর হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে। কারণ আজই বিকেলে তাঁর বাইরে যাবার কথা। সামনেই পুজো। মালপত্র বায়না করতে সাউথ ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গায় তাঁকে যেতে হবে। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর হয়ে হায়দরাবাদ। দিন-আষ্টেকের প্রোগ্রাম। কাল রাত্রে আর আজ ভোরে এখানকার দায়দায়িত্ব সব বুঝিয়ে দিয়ে শেষে আমাকে বললেন, ওঁর গদিতে পৌঁছতে কিছু দেরি হবে। প্রথমত, ব্যাঙ্কে যাওয়া আছে তিনদিনের বিক্রির টাকা জমা দিতে ; দ্বিতীয়ত, খানপাঁচেক ব্যাঙ্ক-ড্রাফট কাটাতে হবে। এই কাজগুলো সারতে তাঁর কমপক্ষে সময় নেবে ঘণ্টা-তিনেক। তার মানে তিনি গদিতে পৌঁছবেন বেলা একটা নাগাদ।"

একটু থামল যতীন হাজরা। গালের ওপর গড়িয়ে-আসা চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল, "কিন্তু একটা ছেড়ে দুটো বাজল, আড়াইটে বাজল, তিনটে বাজল—মামার দেখা নেই। কী-করি কী-করি ভাবতে ভাবতে ফ্ল্যাটে একটা ফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন খারাপ। চারটে পঁচিশে ট্রেন, অথচ সওয়া তিনটে হয়ে গেল—"

"ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেলেন কেন ?" মাঝপথে হঠাৎ মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করে বসলেন।

"ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেলাম এই কারণে যে, কাজেকর্মে দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে গদিতে না এসে গোছগাছ সারতে যদি ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে থাকেন—"

"আচ্ছা। তারপর ?" পাইপ থেকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মিঃ লাহিড়ী।

যতীন হাজরা বলে চলল, "কেবল সারানো হচ্ছে বলে তখন আমাদের গলির সবক'টা টেলিফোনই বিগড়েছে দেখে দৌড়লাম বাঁশগলিতে প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকানে। সেখানে লাইন পেলাম, কিন্তু লাইনে মামাকে পেলাম না। ফোন বেজেই গেল। বারবার তিনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, সেই একই হাল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কেও ফোন করলাম, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম শুনে যে, ব্যাঙ্কে তিনি যানইনি। ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। এমনটা তো মামার কখনো হয় না ! তাহলে কি হঠাৎ অন্য কোনো জরুরি কাজে বেরিয়ে পড়েছেন ? নাকি ব্যাঙ্কে যাবার পথে কোনো বিপদ ঘটল ? এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে গদিতে এসে বিপিনবাবুকে—মানে আমাদের সরকারমশাইকে ব্যাপারটা বললাম। শুনে সরকারমশাই বললেন, ব্যস্ত মানুষ, হয়তো নতুন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। হয়তো ট্রাঙ্ককল পেয়েছেন কোথাও থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছেন। তুমি এক কাজ করো—সোজা একবার ফ্ল্যাটে চলে যাও। দেখো,

স্যুটকেস-হ্যাণ্ডব্যাগ ইত্যাদি গোছগাছ হয়ে গেছে কি না, কিম্বা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন কি না। তোমার সঙ্গে রাস্তাতেও দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো। যাও, চটপট চলে যাও— সাড়ে-তিনটে বেজে গেছে—"

ভিজে রুমালটা পকেটে ভরবার জন্য একটু থামল যতীন হাজরা, তারপর বলল, "ফ্ল্যাটের দুটো চাবির একটা থাকে আমার কাছে। সরকারমশাইয়ের কথামতো চলে এলাম ফ্ল্যাটে। কোলাপসিবল গেটটা টানা রয়েছে বটে, কিন্তু তালাবন্ধ নয়। কেমন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই দেখি—"

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাঝপথেই থেমে গেল যতীন হাজরা। চোটদুটো আবার জলে ভরে উঠল, গলার স্বরে তেমনি গভীর আর্দ্রতা, "প্রথমটা কেমন হকচকিয়ে গেলাম। তারপর লোকজন ডাকাডাকি করলাম এদিক-ওদিক থেকে। ছুটেও এলেন সবাই। এখানকারই টেলিফোনে খবর দিলেন

পুলিশে। তারপর—"

মিঃ লাহিড়ী মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ করলেন, "হুঁ!" তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পায়চারি—ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত।

এতক্ষণ যতীন হাজরার কথার মধ্যে ডুবে ছিলাম, খেয়াল করিনি ইতিমধ্যে পাশের সিট থেকে অভ্র কখন উঠে গেছল। মিঃ লাহিড়ীও লক্ষ করেছেন কি না জানি না। হঠাৎ দরজার গোড়ায় তার গলা পেয়ে ফিরে তাকালাম। সে বলতে বলতে ঢুকছে, "বাঁশগলির প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকানে ফোন করা থেকে শুরু করে বিপিনবাবুর কথা পর্যন্ত যা-কিছু বললেন হাজরামশাই— সেগুলো সবই সত্যি। আমি এইমাত্র ফোন করে জেনে নিলাম সরকারমশাইয়ের কাছ থেকে।"

পুলিশের হেফাজতে লাশ চালান দেবার নির্দেশ দিলেন মিঃ লাহিড়ী। অন্যান্য অফিসাররা তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "আগে ডেডবডি পোস্ট-মর্টেম হোক, তারপর অন্য কথা।"

একজন অফিসার আমতা-আমতা করে বললেন, "কিন্তু দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে স্যার, এ কোনো চোরের কীর্তি। ঘরের মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়বার সময় ভারী কিছু-একটা দিয়ে ঘোষালমশাইয়ের মাথায় এমন একটা মোক্ষম আঘাত দেয়, যাতে তিনি আর টুঁ শব্দটিও করতে না পারেন।"

মিঃ লাহিড়ী শুনলেন, কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "হাজরামশাইকে কি এখন আমরা নিয়ে যেতে পারি? আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, স্যার?"

জবাবটা মিঃ লাহিড়ী দিলেন না। তার আগেই আগ বাড়িয়ে অভ্র বলে উঠল, "হাজরামশাইকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, তবে একটা শর্তে। উনি যাতে পালিয়ে না যান, সেদিকে একটু কড়া নজর রাখতে হবে।"

"তার মানে?" ঘরের প্রতিটি প্রাণীর বিস্ময়-বিমূঢ় গলা থেকে যেন একই সঙ্গে কথাটা বেরিয়ে এল।

"তার মানে আর কিছুই নয়, কড়া নজর না রাখলে উনি আবার পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেন তো!" আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ফুটে উঠল অভ্রর চোখে-মুখে, "পুলিশের হেফাজত থেকে আসামির পালিয়ে যাওয়ার নজির তো এর আগেও পাওয়া গেছে। তাই বলছিলাম কি—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ লাহিড়ী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এই ঘটনায় হাজরামশাই যে আসামি, এটা অনুমান করছ কী করে?"

"ওঁরই কথায়।" থেমে থেমে আস্তে আস্তে অভ্র বলতে শুরু করল, "ডাক্তার বলছেন ঘণ্টা সাত-আট আগে খুনটা ঘটে গেছে। তাঁর অনুমান যে মিথ্যে নয়, সেটা প্রমাণিত হয় শরীরে 'রিগার মর্টিস' শুরু হয়ে যাওয়া দেখে। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে হাজরামশাই নিজের হাতে এই খুনটা করেন এবং বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে লোকডাকাডাকি করে প্রমাণ করতে চান, ঘটনাটি কোনো বাইরের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। প্রসন্ন সমাদ্দারের দোকান থেকে ফোন করা কিংবা বিপিনবাবুর সামনে মামার জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠা—সেগুলো সবই ওঁর স্বপক্ষে অ্যালিবাই তৈরি করার জন্য।"

কৌতূহল যেন বাগ মানছিল না আমা- অভ্রকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সবই মানছি, কি- উনিই যে খুন করেছেন, তার প্রমাণ কোথায়?"

"প্রমাণ ওঁর কথায়। উনি একটু আগেই বললেন, ঘরের কোনো জিনিস উনি স্পর্শ করেননি, নিহত মামার বীভৎস মুখখানা সহ্য করতে পারেননি বলে একখানা চাদর শুধু চাপা দিয়ে দিয়েছেন শরীরে। কথাটা উনি মিথ্যে বলেননি। চাদর উনি সত্যিই চাপা দিয়েছিলেন, তবে বিকেলে বাড়ি ফিরে নয়—সকালে খুন করে যাবার সময়।"

অভ্রর এই উক্তিতে ঘরসুদ্ধ সবাই কেমন থ হয়ে গেল।

বললাম, "কিন্তু সেটা তুই বুঝলি কেমন করে?"

"কঠিন কিছু তো নয়। শুধু আমি কেন, মিস্টার লাহিড়ীও সেটা বুঝে ফেলেছেন এবং বুঝে ফেলেছেন বলেই নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলি দু-চারটে কথা শুধু জিজ্ঞেস করেছেন হাজরামশাইকে। খুনের কেসের তদন্তে আরও অনেক জেরা, অনেক তত্ত্বতালাশের দরকার হয়। মিস্টার লাহিড়ী যে সেদিক দিয়েই যাননি, খেয়াল করেছেন সেটা?"

মিঃ লাহিড়ী এগিয়ে এসে অভ্রর দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে প্রমাণের কথাটা আমার মুখ দিয়ে নয়, তোমার মুখ দিয়েই বেরোক।"

মিঃ লাহিড়ীর কথায় অভ্র যেন আত্মশ্লাঘায় ফুলে উঠল। বলল, "খুনটা হয়েছে সকালে, বিকেলে এসে মৃতের দেহে চাদর চাপা দিলে চাদরটা পরিষ্কার থাকারই কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চাদরটা তাজা রক্তে মাখামাখি হয়ে শুকিয়ে গেছে।"

আমার সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে অভ্র বলে উঠল, "জানি, এরপর কী জিজ্ঞেস করবে আমাকে। মোটিভের কথা তো? মোটিভ একটা নিশ্চয়ই আছে; তবে সেটা খুঁজে বার করবার দায়িত্ব পুলিশের। খুনির এজাহারে একটা মিথ্যে যখন ধরা পড়ে গেছে, তখন অন্যান্য সত্যগুলোও বেরিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না। তবে আমার মনে হয়, অবশ্য হাজরামশাইয়ের হাজার মিথ্যের ফাঁকে যদি একটা কথাও সত্যি বেরিয়ে এসে থাকে, টাকা—তিন দিনের বিক্রির নগদ টাকা—যার অঙ্কটা নেহাত কম নয়।" অভ্র আসামির দিকে ফিরল, "ঠিক বলেছি কি না হাজরামশাই?"

আসামি কোনো জবাব দিল না। জ্বলে-ওঠা চোখ দুটোই যেন বলে দিচ্ছে, অভ্রর কথাগুলো ঠিক কি বেঠিক।

ছবি : অনুপ রায়

বালজাকের একটি উপন্যাসের ডাক্তার-চরিত্র বিয়ানকন। মৃত্যুশয্যায় বালজাক চিৎকার করে বললেন, ডাক্তার বিয়ানকনকে ডাকো, সে ছাড়া কেউ আমাকে সারাতে পারবে না।

বীরপুরুষ

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কাছাকাছি কোথায় যেন একটা আওয়াজ হল ধুপ্ করে। মনে হল, কেউ যেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শিকারি বেড়ালের কুশলী পায়ে লাফিয়ে পড়ল ছাদের ওপর। তারপর আবার সব আগের মতোই সুনসান।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোকুল রুদ্র কোনো এক পাক্ষিক পত্রিকার জন্যে গা-ছমছম-করা অদ্ভুতুড়ে একটি অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শেষ করে সবে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তখনই এই শব্দ। তাঁর তন্দ্রা-টন্দ্রা সব চটকে গেল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটোকে সামান্য ফাঁক করে দেখলেন, ঠিক পাশেই স্ত্রী অকাতরে ঘুমোচ্ছেন।

ঘরের বাতাসটাকে কেমন যেন গুমোট বলে মনে হল গোকুলবাবুর। একটা আরশোলা সমানে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে ফড়ফড় করে উড়ে গিয়ে শুঁড় নাড়াচ্ছে। কোণের দেওয়ালে গলায় দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে ঠাকুর্দার আমলের তানপুরা।

গোকুলবাবু চোখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকালেন। শীতের কুয়াশা জড়ানো আকাশ তারায়-তারায় ঝলমল করছে। রাত্রি এখন ক'টা হবে? আড়াইটে তো বটেই! গোকুলবাবু কানদুটোকে সজাগ করে শোনবার চেষ্টা করলেন আর কোনো আওয়াজ-টাওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে কোথা দিয়ে যে কী হয়ে যায়, বলা মুশকিল।

হঠাৎ মনে হল কে যেন হালকা পায়ে ছাদের ওপর চক্কর দিতে দিতে বাড়ির ভেতরের অবস্থাটা আঁচ করে নেবার চেষ্টা করছে।

গোকুলবাবু ফিসফিস করে স্ত্রীকে ডাকলেন, "এই শুনছ—"

ঘুম নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শ্রীমতী রুদ্র চোখ না খুলেই জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী হল আবার এত রাত্তিরে?"

"আঃ, চোখটা খোলোই না একবার।"

গোকুলবাবুর স্ত্রী উমা দেবী চোখের পাতা দুটো সামান্য ফাঁক করতেই গোকুলবাবু গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন, "বাড়িতে বোধহয় ডাকাত পড়েছে!"

"ডাকাত!" কথাটা শুনেই উমা দেবী ছিটকে উঠে বসলেন। "কী, বলছ কী! বাড়িতে ডাকাত পড়েছে আর তুমি কিনা পুরুষমানুষ হয়ে খাটে শুয়ে বিনবিন করে ঘামছ! ছিঃ ছিঃ!"

গোকুলবাবু স্ত্রীর কথার কোনো লাগসই জবাব দিতে পারলেন না।

"তা, ডাকাত বাবাজীবনটি কোথায়?" রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন উমা দেবী। গোকুলবাবু কোনো কথা না বলে আঙুল তুললেন ছাদের দিকে। উমা দেবী বালিশ-টালিশ উলটে ফেলে খাট থেকে নামতে নামতে বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।"

উমা দেবী দারোগা পিতার সাহসী কন্যা। ভয় কাকে বলে তা তিনি জানেন না। বিয়ের পরেও কতদিন তিনি রাত-বিরেতে পিতার সঙ্গে জিপে চড়ে ছুটে গেছেন মাছ ধরা, বাঁদর ধরা, হাতি ধরার মতো ডাকাত ধরা দেখতে। আর এ-সব সামান্য খুটখাট আওয়াজ তো তাঁর কাছে নস্যি! রিটায়ার করার পর গোকুলবাবুর শ্বশুরমশাই এখন এই বাড়িতেই থাকেন। রাতদিন শুধু ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন ভদ্রলোক।

চাকর নাগাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে উমা দেবী দুম্ দুম্ করে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে। মশারি তুলে নামতে গিয়ে গোকুলবাবুর হাত লেগে চশমাটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ উঠল। বলতে গেলে, এই চশমা ছাড়া তিনি তো একরকম অন্ধই। খালি চোখে মানুষজন গাছপালা—সব কিছুই ঝাপসা দেখেন।

উমা দেবীর পায়ের আওয়াজ ছাদের দিকে যেতেই গোকুলবাবু সোজা ঢুকে গেলেন বাথরুমে। এটাকেই এখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হল তাঁর।

দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে দিলেন। পায়ের নীচে ভিজে মেঝে থেকে ঠাণ্ডা একটা ভাপ উঠছে। স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে আসা তারার আলোয় গোকুলবাবুর চোখ আটকে গেল বাথরুমের কোণে জড়ো করে রাখা কাঠের টুকরোগুলোর দিকে। তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে ওগুলোকে

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এইসব ভাবতে না ভাবতেই দরজার বাইরে একজোড়া পায়ের মৃদু শব্দ শোনা গেল। হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে দরজার পাশে জমাট হয়ে থাকা অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর লেখক শ্রীযুক্ত গোকুল রুদ্র।

গোকুলবাবু মনেই ভাবলেন, এই কাঠের ঘায়ে ডাকাতকে যদি কাত করা যায় তাহলে আর তাঁকে পায় কে! স্ত্রীর কাপুরুষ-টাপুরুষ জাতীয় অপমানজনক মন্তব্যগুলোর একটা জুতসই জবাবও দেওয়া যাবে! ভাবতে ভাবতেই তাঁর মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠল, তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে।

গোকুলবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করবেন না করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় তাঁকে সামান্য একটু চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাদুটো আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল! দরজার ঠিক বাইরেই অন্ধকারের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা অস্পষ্ট বিশাল শরীর। গোকুলবাবু আর কোনো দিকে না তাকিয়ে হাতের কাঠের টুকরোটা দিয়ে মোক্ষম এক ঘা বসিয়ে দিলেন ডাকাতটার মাথায়। সামান্য একটা ঘা, কিন্তু তাতেই ডাকাতটা তার বিশাল শরীর নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। লুটিয়ে পড়বার আগে ডাকাতটার গলা দিয়ে শুধু একটা শব্দ হল "উমা।"

ঘটনার আকস্মিকতায় গোকুলবাবু এমনই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর এই ভাবটা কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। একটু পরেই বাথরুমের সামনের আলোটা জ্বলে উঠল। গোকুলবাবু সেই আলোতেই দেখলেন, বাথরুমের ঠিক সামনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ···

উমা দেবী যেন বাঘের মতো গর্জন করে তেড়ে এলেন গোকুলবাবুর দিকে, "এ কী! তুমি আমার বাবাকে খুন করেছ! এক্ষুনি আমি পুলিশ ডাকব, লোক জড় করব। খুনি, গুণ্ডা কোথাকার।"

গোকুলবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "আমি কী করে জানব যে তোমার বাবা এত রাত্তিরে এরকমভাবে চোরের মতো পা টিপে টিপে বাথরুমে এসে হানা দেবেন—"

"খবর্দার! আমার বাবা সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলবে না তুমি। বুড়ো মানুষ, রাত্তিরবেলা ঘুম আসছিল না বলে ছাদে পায়চারি করতে করতে চুরুট টানছিলেন, আর তুমি কিনা ভাবলে ডাকাত!"

"না, মানে—কিন্তু উনি ছাদ থেকে নেমে এরকম পা টিপে টিপে বাথরুমেই বা আসছিলেন কেন?"

"সে তো তোমারই জন্যে। ছাদে উঠে তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলুম বুঝি ডাকাত কিংবা ভূতে তোমায় ধরে নিয়ে গেছে। তাই তো তোমায় ভালমানুষি করে উদ্ধার করতে এসেছিলেন আমার বাবা, কিন্তু তুমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে—"

গোকুলবাবু আর একটাও কথা বলতে পারলেন না। এর পর আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! কোনোরকমে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েই পাড়ার ডাক্তার ঘনশ্যাম গোপের বাড়ির দিকে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চললেন তিনি।

ছবি : দেবাশিস দেব

কাকা-কাহিনী

সুনির্মল চক্রবর্তী

পেটের ব্যথায় খায়নি যে ভাত কাল,
সে আমাদের পড়শি ছেদিলাল!
টুপি মাথায় ঘোরে সে দিনভোর,
মাথায় কিচ্ছু বুদ্ধি যে নেই ওর!
চোখটা ছোট, লম্বা চিকন নাক,
সেদিন নাকে বসল একটা কাক।
কাকটা হঠাৎ যেই ডেকেছে কা-কা,
ছেদিলালকে যায় না ধরে রাখা।
চেঁচিয়ে মাথায় করল বাড়িখানা,
ব্যাপারখানা যায়নি আগে জানা।
বলল ডেকে, শুনলে নাকি কিছু,
ভাইপো-কাক এক নিল আমার পিছু
এতদিনে চিনতে যে বিলকুল,
হয়নি কোনোই সেই বেচারির ভুল।
কিন্তু বড়ই হচ্ছে যে আফসোস,
আমার কি আর হল তেমন দোষ?
করতে আদর যেই বাড়ালাম হাত,
অমনি মনে পেলাম জোর আঘাত।
সেই বেচারি উড়ল আকাশপানে,
কাকা হবার নেই কি কোনো মানে?

ছবি : অহিভূষণ মালিক

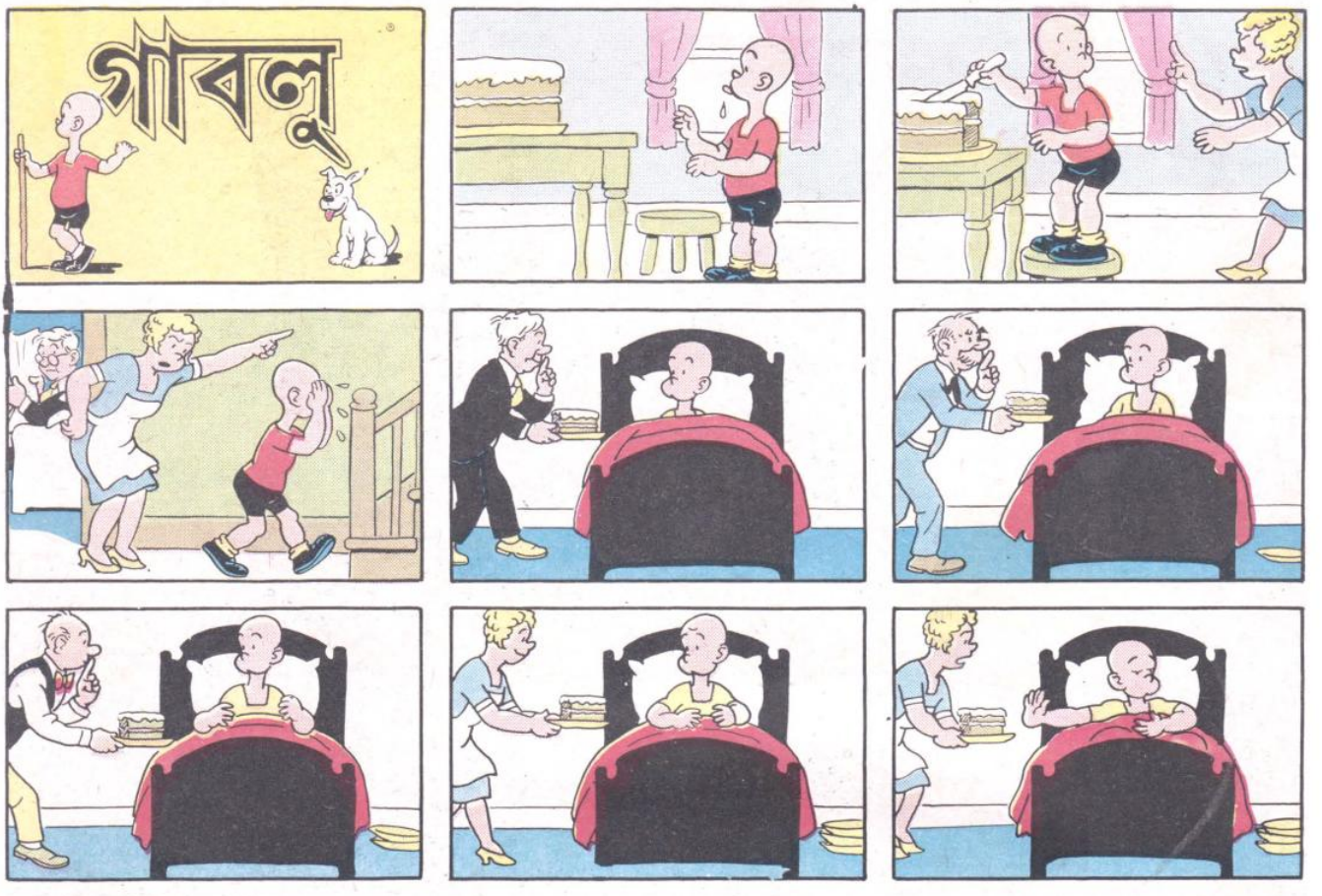

গাবলু

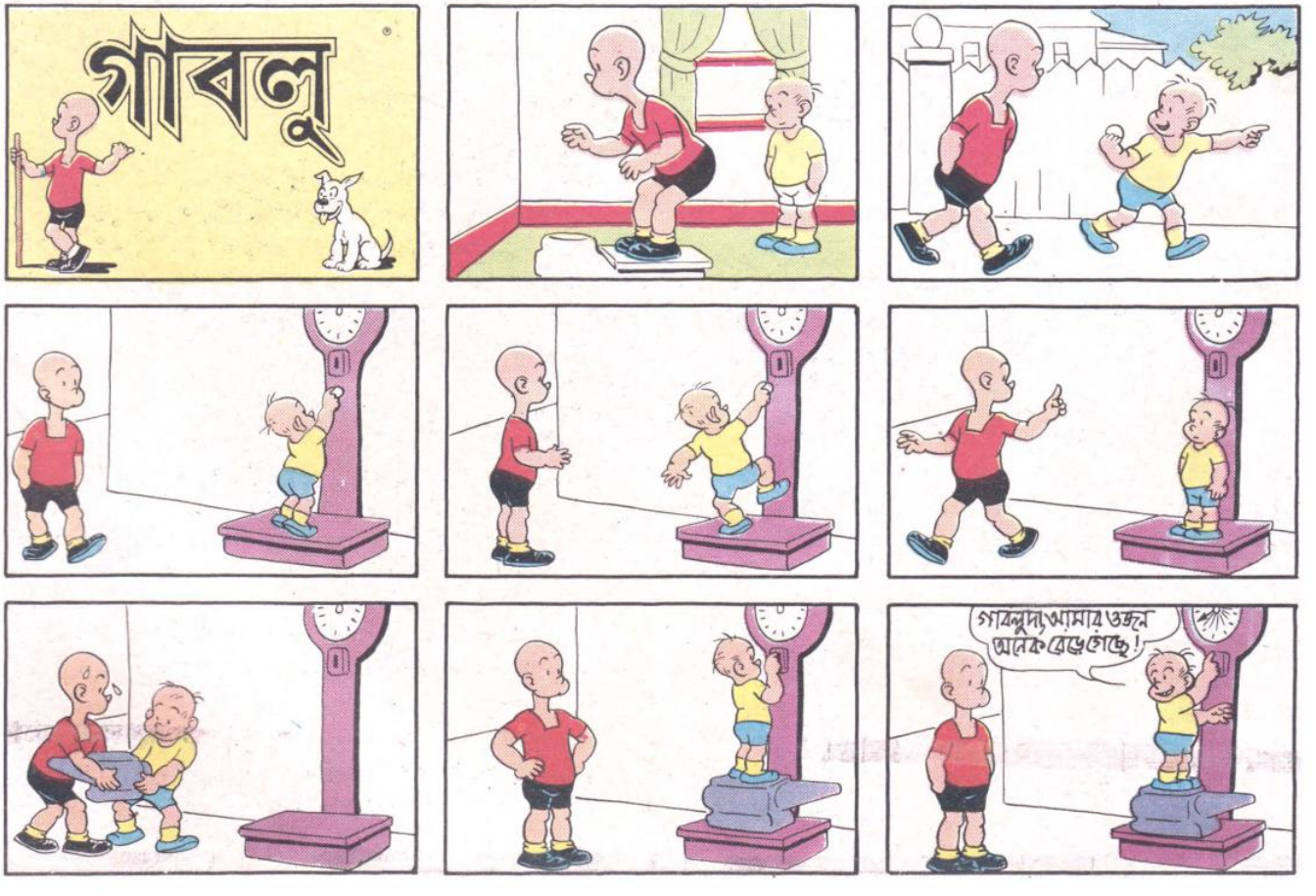

গাবলু
গাবলুদা, আমার ওজন অনেক বেড়ে গেছে!

ফ্ল্যাশের রকেট ঢুকতেই ভেঙে পড়ল মিংয়ের প্রাসাদের একটা অংশ...
মিং নিজেই আহত !

শিল্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল

অশোক রায়

ইদানীং প্রতি বছরই শিল্ড শুরুর ঠিক আগেই বাতাসে ভেসে বেড়ায় কথাটা—'শিল্ডের সেই গ্ল্যামার আর নেই'। কথাটা শুনলে মনে হয় ফুটবলপ্রেমিক কলকাতার কাছেও শিল্ডের আকর্ষণ বুঝি কমছে। কিন্তু জেলার মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা খেলাগুলো ক্রমশ গুটিয়ে ছোট হয়ে নিজস্ব প্রিয় দলগুলোর অস্তিত্বের মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা যথারীতি নড়েচড়ে বসে। আর ফাইনালে যদি কলকাতার দুই প্রধান থাকে তাহলে তো কথাই নেই। ওই একটি দিনেই দুটি জার্সির রঙে ভাগ হয়ে গিয়ে উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে কলকাতা জানিয়ে দেয়, কেন তার আর এক নাম 'ফুটবল-নগরী'। এবারের শিল্ডেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোয়ার্টার ফাইনাল স্টেজে ছটি দলকে দু-ভাগে ভাগ করে যেই শুরু হল লিগ খেলা অমনি তিন প্রধানের সমর্থকরা সজাগ হয়ে উঠলেন। একদিকে মোহনবাগান, এরিয়ান এবং ব্যাঙ্কক ব্যাঙ্ক আর একদিকে শক্তি পরীক্ষায় নামল ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান এবং গুর্খা ব্রিগেড। ঠিকই ছিল, প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সেমি-ফাইনালে উঠবে।

লিগ পর্যায়ের প্রথম খেলায় এরিয়ানকে তিন গোল দিয়ে পরের ম্যাচেই ব্যাঙ্কের ভল্টে আটকে গেল মোহনবাগান, ২-২ ফলাফলে। অন্য গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল দুটি দলকেই হারাল। এর মধ্যে দেবাশিস রায়ের গোলে এই বছরের 'অপরাজিত' আখ্যা খোয়াল মহমেডান। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান আর ব্যাঙ্কক ব্যাঙ্ক এবং অন্য গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান দুই গ্রুপের প্রথম দুটি স্থান অধিকার করল। সেমি-ফাইনালে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর গোলে ইস্টবেঙ্গল এবং বিকাশ পাঁজির গোলে মোহনবাগান জিততেই ১৯৮৪-র শিল্ড ফাইনালে মুখোমুখি দাঁড়াল কলকাতার দুই প্রধান। এবারও মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি দাঁড়ানো মাত্রই গোটা কলকাতা মুহূর্তে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল লাল-হলুদ আর মেরুন-সবুজ সমর্থকদের সবিক্রম আস্ফালন। চায়ের দোকান, পাড়ার রোয়াক, এমনকী বাড়ির

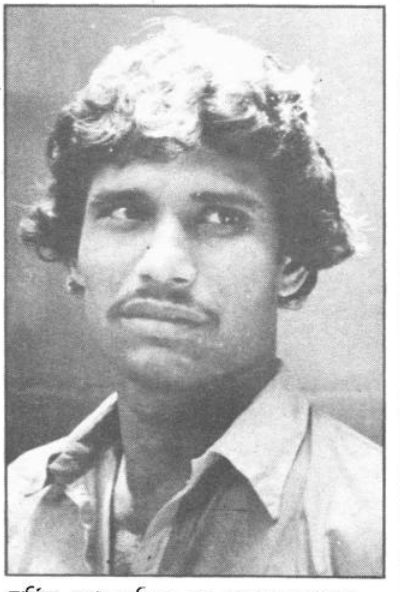

কার্তিক শেঠ (চকিতে বল পাচ্ছেন জালে)

বৈঠকখানাগুলো পর্যন্ত বাক্যের কুস্তির আখড়া হয়ে উঠল। দু'পক্ষের চড়া চিৎকারে টিভি অ্যান্টেনার মাথা থেকে উড়ে পালাল কাক, কোলের ছেলে ককিয়ে উঠল ঝগড়া আর চ্যাঁচানির দাপটে। এবং এভাবেই কিক-অফের আগে পর্যন্ত দুটি পক্ষই সমান্তরালভাবে উত্তেজনার চুড়োর দিকে এগিয়ে গেল পরিসংখ্যানের 'অক্সিজেন' সিলিণ্ডার সঙ্গে নিয়ে।

শিল্ড ফাইনালের আগে পর্যন্ত এই বছর দু'পক্ষের মোলাকাত হয়েছিল দুটি ক্ষেত্রে। ফেডারেশন কাপে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল, লিগে বদলা নিয়েছিল মোহনবাগান। সুতরাং শিল্ড ফাইনালে তৃতীয় সাক্ষাৎকার ছিল এক পক্ষের এগিয়ে যাবার লড়াই।

দেশের সেরা মিড-ফিল্ডার প্রশান্ত ব্যানার্জি অসুস্থ থাকায় মোহনবাগান শুরুতেই একটু কমজোরি হয়ে পড়েছিল। যদিও পরিশ্রমী বিকাশ পাঁজি একার কাঁধে অনেকখানি দায়িত্ব নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছেন। ফরোয়ার্ড লাইনে কৃশানু দে এদিনও পায়ের সূক্ষ্ম কাজে মোহিত করেছেন দর্শকদের। তবে কৃশানুকে মনে থাকবে প্রথমার্ধের একুশ মিনিটের মাথায় একটা চোখ-ধাঁধানো শটের জন্যে। অনায়াসে দিনের সেরা হিসেবে চিহ্নিত শটটি গোলরক্ষক ভাস্করকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেও প্রতিহত হয় পোস্টে। বলের গমন-পথটি সামান্য এদিক-ওদিক হলেই কৃশানু 'হিরো' বনে যেতেন। তবে কৃশানুকে সহায়তা করার লোক না থাকায় ইস্টবেঙ্গল ডিফেণ্ডারদের কাজ কিছুটা সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের দুই কপাট মনোরঞ্জন-তরুণ ছিলেন খুবই আঁটোসাটো। মাঝমাঠে সুদীপ চ্যাটার্জি অন্যদিনের মতো খেলতে না পারলেও সুনির্মল চক্রবর্তী ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। তবে দুই 'গোল-ক্ষুধার্ত' ফরোয়ার্ড বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস রায় যেন যোগী হয়ে গিয়েছিলেন। কুড়ি মিনিটের মাথায় ওভারল্যাপে উঠে আসা অলোকের সেণ্টারে বিশ্বজিৎ কোন্ আশ্চর্য কারণে মাথা ছোঁয়াতে পারলেন না কিংবা দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ডিস্‌টান্সে পৌঁছেও দেবাশিস কী করে বল বাইরে মারলেন এর কোনো সদুত্তর পাননি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

খেলা উঁচুমানের হয়নি। সাম্প্রতিককালে এই দুই বড় দলের খেলায় এত মিস্-পাসও কেউ দেখেছেন বলে মনে হয় না। তবে ৩৩ মিনিটে কার্তিককৃত গোলটিই ছিল খেলার একমাত্র ব্যতিক্রম। রাইট ব্যাক কৃষ্ণেন্দু ফাইনাল ট্যাকলে যেতেই চমৎকার বডি ফেণ্টে তাঁকে কাটিয়ে নিচু সেণ্টারে ছ' গজের মধ্যে বল রাখেন সুদীপ। ডিফেণ্ডারদের ভিড়ের মধ্যে থেকে ছিটকে ওঠেন কার্তিক এবং চকিতে বল পাঠান জালে। ওই একটিমাত্র গোলেই নির্ধারিত হয়ে গেল চুরাশির আই· এফ· এ· শিল্ড কোন্ টেণ্টে যাচ্ছে।

ফাইনাল খেলার একটি উত্তেজনাময় মুহূর্তে বলের দখল নিয়ে লড়াই চলছে

মোহনবাগানের গোলে বল ঢুকছে, গোলকিপার অসহায়

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

রাজা গুপ্ত

নির্মেঘ আকাশে ঝিকমিকে সোনালি তারার মতো মঞ্চের ওপর বসে ছিলেন একঝাঁক ক্রিকেটার। রঞ্জি ট্রফির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট-নক্ষত্ররা। ওঁদের অনেকেরই ব্যস্ত বর্তমান এখন অতীতের আশ্রয়ে। ক্রিকেট, সুন্দর ক্রিকেটের সেই আশ্চর্য অনুষ্ঠানে চলো আমরাও ঘুরে আসি। কান পেতে শোনার চেষ্টা করি তাঁদের কাল্পনিক সংলাপগুলো, চিনে নিই সূর্যের আলোয় ডোবানো তাঁদের টুকরো-টুকরো স্মৃতি-চিহ্নগুলো।

ঘনিষ্ঠভাবে বসে ছিলেন বিজয় হাজারে ও গুল মহম্মদ। ১৯৪৬ সালে হোলকারের বিরুদ্ধে এই জুটি ৫৭৭ রানের যে রেকর্ড গড়েছিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এর চেয়ে বড় রানের রেকর্ড আজও কোনো দেশে তৈরি হয়নি। স্মৃতিচারণ করছিলেন বিজয় মার্চেন্ট, রুসি মোদিও। দুজনের মাথায় বিরাট টাক। এবং দুজনের সংগ্রহেই বিরাট রেকর্ড। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে অ্যাভারেজ (৯৮·৩৫) নিয়ে মার্চেন্ট আজও রঞ্জি ট্রফিতে এক নম্বর আসনটি দখলে রেখেছেন। রুসি মোদি পরপর পাঁচ ইনিংসে সেঞ্চুরি করার অলৌকিক কাণ্ড করেছিলেন ১৯৪৩-৪৪ সালে। রঞ্জি ট্রফিতে এক সিজনে হাজার রান করার একমাত্র কৃতিত্বও ওঁর। দুই বোলারও ছিলেন পাশাপাশি। বাংলার প্রেমাংশু চ্যাটার্জি আর সুভাষ গুপ্তে। "ফার্গি, তোমার লেগ স্পিনের অনেক প্রশংসাই তুমি পেয়েছ, তবু আমার মনে হয় তোমার গুগলিটা স্পট করাই ছিল বেশি শক্ত।" গুপ্তে হাসলেন। "আসামের বিরুদ্ধে তোমার বোলিংটাই বা কম কিসে ? সব কটা উইকেট একা নিয়ে তো একটা এভারলাস্টিং রেকর্ড করে রেখেছ।" স্মৃতিতে ডুব দিয়ে হেসে উঠলেন ওঁরা দুজনেই।

ভারতীয় ক্রিকেটের 'লাকি' ক্যাপ্টেন অজিত ওয়াড়েকার বসে ছিলেন একটু চুপচাপ। কে যেন তুললেন কথাটা। "ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো স্ট্রং টিমকেও আমরা হারিয়েছি, আর ওদেরই মাটিতে। অজিত, মনে আছে উনিশশো একাত্তরের সেই দিনগুলো ?" মৃদু হাসলেন ওয়াড়েকার। দুরানির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেই সঙ্গে মনে আছে সেলিমের দুটো ম্যাজিক ডেলিভারি। লয়েড আর সোবার্সকে পরপর আউট করে ম্যাচের রঙটাই পালটে দিয়েছিল ও।"

এক জায়গায় বসে ছিলেন বেদি, প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বেঙ্কটরাঘবন। ভারতীয় ক্রিকেটের চার সুখ্যাত স্পিনার। চারজনকে একসঙ্গে টেস্ট খেলতে মাত্র একবারই দেখা গিয়েছিল। 'চন্দ্রা'র উদ্দেশে 'প্রাস' বললেন, "সেভেনটি ওয়ানে ওভাল টেস্টে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চন্দ্রার বোলিং আমার দেখা বেস্ট বোলিং—"

প্রসন্নকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রশেখর চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন একটু দূরে-বসা একনাথ সোলকারকে। একটু চাপা কণ্ঠে বললেন, "এক্কির ক্যাচই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। নট আর ফ্লেচারের দুটো ডাইভিং ক্যাচ সত্যিই ভোলার নয়।" পাশ থেকে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন বেদি।

তিনজনের মধ্যে ছোট্ট তর্ক উঠেছিল কার ক্রিকেট-জীবনের শুরুটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ? নরি কনট্রাক্টর রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলতে নেমেই দু ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছিলেন। গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ রঞ্জিতে আরম্ভ করেছিলেন ২৩০ রানের ইনিংস দিয়ে। রঞ্জিতে আর্বিভাবেই এত বড় ইনিংস আর কেউ খেলেননি।

বিজয় হাজারে (প্রবীণ বয়সে)

বিশ্বনাথের টেস্ট-জীবনের শুরুটাও চমক দিয়ে। প্রথম ইনিংসের শূন্য, দ্বিতীয় দফায় চোখ-ধাঁধানো সেঞ্চুরি। দুই ব্যাটসম্যানের সঙ্গে যোগ দিলেন জি এম রাও। সার্ভিসেসের এই বোলারটি প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেছিলেন। পাছে ঘটনাটি মন থেকে মুছে যায় বোধহয় সেইজন্যই ঠিক পরের ম্যাচেই দু' ইনিংসে আবার দুটি হ্যাটট্রিক করলেন রাও। তার মানে পরপর দুটি ম্যাচে তিনটি হ্যাটট্রিক। বলা বাহুল্য ত্রয়ীর তর্ক অমীমাংসিতই ছিল।

এত আনন্দের মধ্যেও একটু ছোঁয়া ছিল বিষাদের। কেন যেন ম্রিয়মাণ ছিলেন বি বি নিম্বলকার, রাজিন্দার গোয়েল আর পদ্মাকর শিভালকর। রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েও (৪৪৩) টেস্টে ডাক পাননি নিম্বলকার। যথাক্রমে ছশো এবং পাঁচশো উইকেট নিয়েও টেস্টে নির্বাচন পাননি দুই লেফট-আর্ম স্পিনার। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন ঘটনা বোধ হয় কখনও ঘটেনি। ম্রিয়মাণ ছিলেন পঙ্কজ রায়ও। কে যেন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভিনু মাঁকড়ের সঙ্গে টেস্টে গড়া প্রথম উইকেটের ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটার কথা। পঙ্কজ রায়ের পাশে আজ আর ভিনুভাই নেই। ঠিক এইরকমই ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল চান্দু সরবটেরও। সারের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে গড়া ২৪৯ রানের সেই রেকর্ডের অন্য অংশীদার সুঁটে ব্যানার্জি তাঁর পাশের চেয়ারে অনুপস্থিত। জীবনের শেষ ইনিংস খেলে চলে গেছেন সুঁটে ব্যানার্জিও।

এই আসরে হাজির ছিলেন না আরও কয়েকটি মুখ। এঁরা হলেন মুস্তাক আলি, কপিলদেব এবং লালা অমরনাথ। মুস্তাক আসেননি আমন্ত্রণলিপির বয়ান মনোমতো না হওয়ায়, কপিল আসেননি বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায়। আর লালাকে ডাকাই হয়নি ! ব্র্যাডম্যানের মতো কঠিন মানুষের মন যিনি জয় করেছিলেন অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাটিংয়ে, ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের প্রথম সেঞ্চুরিটি এসেছিল যাঁর ব্যাট থেকে, রঞ্জি ট্রফিতে শূন্য রানে চার উইকেট নেবার অবিশ্বাস্য রেকর্ড যাঁর ঝুলিতে, তিনি বিয়াল্লিশজনের দলে আমন্ত্রণ পাননি। জানি না এক প্রবীণ প্রতিভার প্রতি এই অবমাননায় লজ্জা কার ?

রাজার সাজা

সম্রাট রায়

আমাদের একটা মস্ত বড় গুণ—আমরা খুব অল্প দিনেই একটা অভ্যাস গড়ে নিতে পারি। যেমন, একটানা টেস্ট ম্যাচে হেরে-হেরে হারের একটা অভ্যাস গড়ে নিয়েছি। গত উনত্রিশটা টেস্টে ভারত যে একটাও জিততে পারেনি এই নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা বা দুঃখবোধ নেই। প্রুডেনশিয়াল কাপ জেতার পরে আমাদের ক্রিকেটারদের হঠাৎই দেবতা বানানো শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছিল, একদিনের সীমায়িত ওভার ম্যাচে আমরাই সম্রাট। ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আমাদের ধারণার সেই কাঁচের কক্ষে ফাইভ-নিলের ঠোক্কর দিয়ে জানিয়েছিল যে, ভারতের বিশ্বকাপ জয় নেহাতই একটি তাৎক্ষণিক ঘটনামাত্র। নিজেদের প্রকৃত অবস্থাটা ভালভাবে বুঝে নেবার আগেই এশিয়া কাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হল। ব্যস্, ক্রিকেটারদের মাথায় গ্ল্যামারের মুকুট আর পকেটে অঢেল অর্থ পৌঁছে যেতে শুরু হল। ফিরে দেখা হল না ভারতীয় ক্রিকেটারদের দোষত্রুটিগুলো কোথায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ওয়ান-ডে ম্যাচের সিরিজে পরিষ্কার থ্রি-নিল খাওয়ার পরেই নতুন করে একটা ঝাঁকুনি খেলাম আমরা। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অনুমান করতে পারি, টেস্ট ম্যাচের মতোই ওয়ান-ডে ম্যাচেও হারের অভ্যাস গড়ে নিতে আমাদের বোধহয় খুব একটা অসুবিধে হবে না।

অন্তত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যা খেলা দেখা গেল তাতে শেষ পর্যন্ত এই সত্য সংশয়াতীতভাবেই প্রমাণিত হল যে, লিমিটেড ওভার ম্যাচেও বেশ কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটার দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবেই খেলা হারাচ্ছেন। ওপেনিংয়ে গোলাম পার্কার এবং সুরিন্দর খান্নাকে দেখে কান্না পেয়েছে। দুজনেই ছিলেন অনিশ্চিত এবং আউট সুইং ঠোকরাতে ব্যাট বাড়িয়েছেন যখন-তখন। সুইং খেলার ব্যাপারে এত কাঁচা ওপেনার ভারতীয় ক্রিকেটেও অনেকদিন দেখা যায়নি! দোষ শুধু ওপেনারদের নয়, মাঝপর্বও ছিল দাপটহীন, ব্যাটিং-ব্যক্তিত্বরহিত। মিডল-অর্ডারের শোচনীয় ব্যর্থতায় ভারতীয় ইনিংসের কোমরটাও হয়ে পড়েছিল কমজোরি। অবশ্য দুটি-একটি ব্যতিক্রম হয়তো ছিল। কিন্তু শাস্ত্রী, বিনি, কপিল কিংবা গাওস্করদের রুখে দাঁড়ানোর টুকরো-টুকরো চেষ্টাগুলো ছিল এতই বিক্ষিপ্ত যে, সেগুলো জয়ের প্রয়োজনে কখনোই তেমন বড় ভূমিকা নিতে পারেনি। রেকম্যান, লসনের সুইং এবং হোগানের স্পিনেই যদি ভারতীয়দের এই হাল হয়, তাহলে লিলি বা অল্ডারম্যানের মুখে পড়লে না জানি কী হত!

ম্যাচ জেতানোর জন্যে নয়, ভারতের বোলিং ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং প্র্যাকটিসের পক্ষে একেবারে আদর্শ।

পেস, স্পিন দু'বিভাগেই তেল-মশলা না থাকায় বোলিং ছিল বিস্বাদ। সর্বদাই কেন যেন মনে হয়েছে কপিল ছাড়া বাকি বোলারদের শক্তির ব্যাটারি ডাউন। বৈচিত্র্যহীন এবং দুর্বল আক্রমণের পুঁজি নিয়ে বিপক্ষকে বেঁধে রাখার শুধু স্বপ্নই দেখেছে ভারত। কামড় দেওয়া দূরের কথা, ভারতীয় বোলিংয়ের হাল দেখে মনে হচ্ছিল বোলারদের মাড়িতে এখনও দাঁতই গজায়নি। এমন নিরুপদ্রব ক্লাব-স্ট্যাণ্ডার্ডের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পিক্‌নিক্ করে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা। এরই মধ্যে কেউ-কেউ আবার ভারী মজার মন্তব্য জুড়েছেন—অস্ট্রেলিয়ান টিমে লেফ্‌ট-হ্যাণ্ডারের সংখ্যা বেশি থাকায় ভারতীয় বোলাররা নাকি 'ছন্দ' খুঁজে পাননি! নাচতে না জানলে অক্ষমতার দোষ উঠোনের ঘাড়ে চাপানোর রেওয়াজ আছে। বোধহয় এর পর থেকেই অন্য দেশকে সফরে আমন্ত্রণ জানানোর সময় শর্ত হিসেবে লেফ্‌ট-হ্যাণ্ডারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেবার প্রস্তাব দেবে ভারত।

আর, ফিল্ডিংয়ের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল। ক্যাচ ধরায় তৎপরতার অভাব আর গ্রাউণ্ড ফিল্ডিংয়ে নড়াচড়ায় মন্থরতা দেখে মনে হয়েছে ভারতীয় ফিল্ডারদের হাতের চেটোয় গর্ত আর বুটের তলায় চটচটে আঠা লাগানো। কে বলবে কটা দিন আগে বিশ্ব-কাপ আর এশিয়া-কাপ জিতেছিলাম আমরাই!

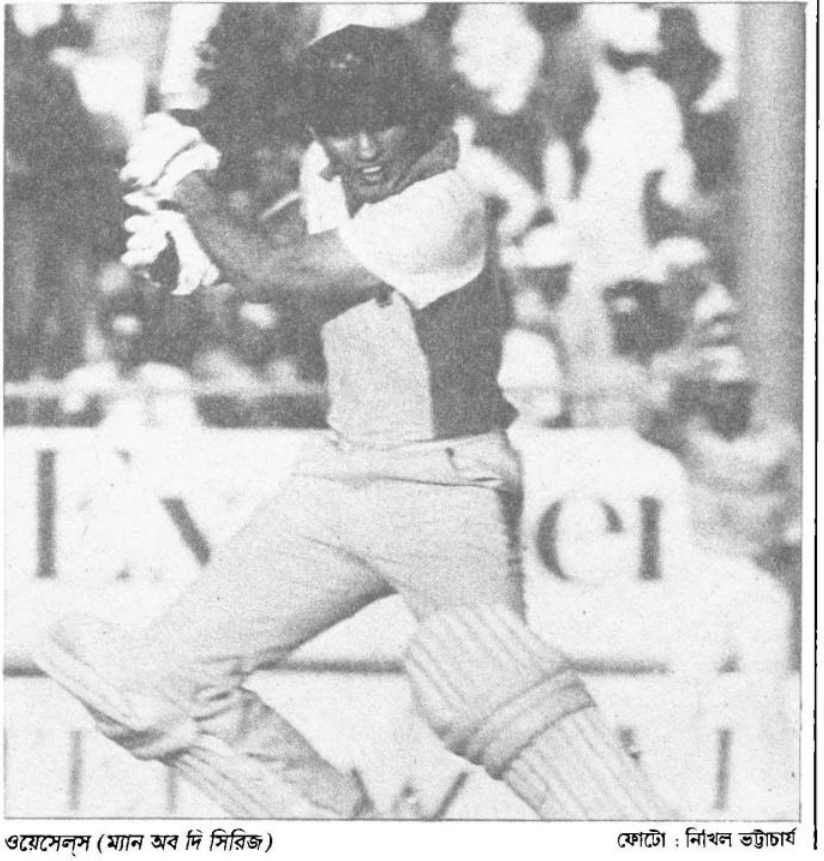

ওয়েসেল্‌স (ম্যান অব দি সিরিজ) ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

একক লড়াইতে রাইস রাজা

নৃপতি চৌধুরী

না দেখেও বলতে পারি, সেদিন পাঁচজনের ভুরুই বাঁকানো ধনুকের মতো ঠিকরে উঠেছিল ঔদ্ধত্যে, চাপা চোয়ালে আঁকা ছিল লড়াইয়ের ছবিটা। 'চলে এসো, এক হাত হয়ে যাক'—কতকটা এই ধরনের হুমকি দিয়েই শুরু হয়েছিল ক্রিকেটের সেরা পাঁচ প্রতিভার চ্যালেঞ্জ ম্যাচ। ইংল্যাণ্ডের টনটনে সিল্ককাট সিঙ্গল উইকেট টুর্নামেন্টে হাজির ছিলেন এই মুহূর্তে ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন অল-রাউণ্ডার—ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বথাম, নিউজিল্যাণ্ডের রিচার্ড হ্যাডলি, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাইভ রাইস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যালকম মার্শাল এবং ভারতের কপিলদেব।

এই মুহূর্তে ফর্মের বিচারে এক নম্বরে রয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের রিচার্ড হ্যাডলি। ১৯৬৯ সাল থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ ম্যাচের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কাউন্টি ক্রিকেটে এক মরসুমে 'ডবল' করা এখন প্রায় অসম্ভব। অথচ মাত্র ২১টি ম্যাচেই হ্যাডলি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এবার। কদিন আগে ইংলাণ্ডকে ক্রাইস্ট চার্চ টেস্টে হারিয়ে সর্বপ্রথম টেস্ট সিরিজ জিতেছিল নিউজিল্যাণ্ড। সেই ম্যাচের নায়ক ছিলেন হ্যাডলি।

ইংল্যাণ্ডের ইয়ান বথাম মাঠে নামলেই রেকর্ড-বুকে কিছু পরিবর্তনের জন্যে পরিসংখ্যানবিদদের তৈরি থাকতে হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান এই ক্রিকেট অলরাউণ্ডারটি সম্প্রতি ৪০০০ রান এবং ৩০০ উইকেট সংগ্রহের এক দুর্লভ রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তেরোটি সেঞ্চুরি আর ৮৪টি ক্যাচ ধরার অলরাউণ্ড পারফরমেন্সের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেন বথাম অন্যদের থেকে আলাদা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ক'দিন আগে লর্ডস টেস্টে বথাম এক ইনিংসে ছটি উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছেন। এক ইনিংসে পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নেবার বিশ্ব-রেকর্ড ছিল এস·এফ· বারনেসের (২৪ বার)। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বথাম ছুঁলেন বারনেসকে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যালকম মার্শাল অবশ্য ব্যাট হাতে তেমন বড় মাপের কৃতিত্বের অধিকারী নন। কিন্তু পেস বোলিংয়ের দাপটে গোটা ক্রিকেট-বিশ্বকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভারতের কপিলদেব সম্পর্কে নতুন আর কী বলব। ভারতের মতো একটি দুর্বল দেশের যাবতীয় বোলিংয়ের দায়িত্ব

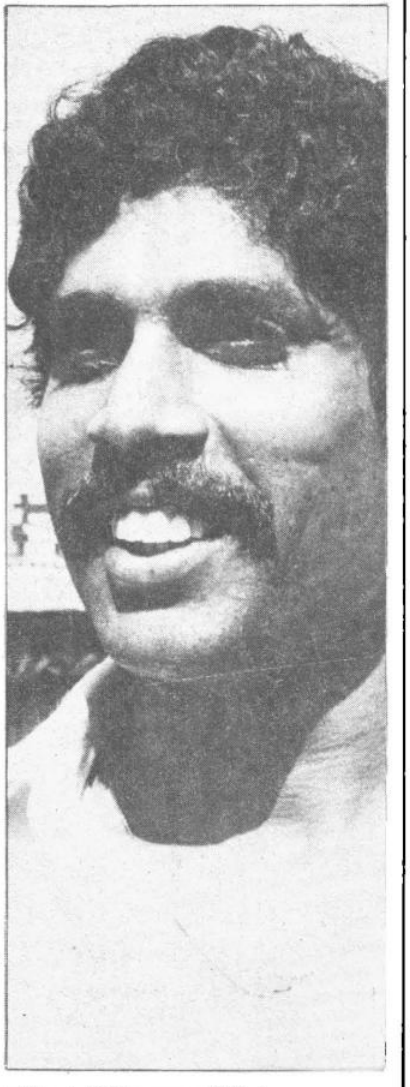

কপিল (অদ্বিতীয় হয়েও দ্বিতীয়)

একার কাঁধে বহন করে চলেছেন কপিলদেব। ১৯৮৩ সালে বিশ্বে তিনিই একমাত্র বোলার হিসেবে ৫০টি টেস্ট উইকেট পেয়েছেন। কপিলের কয়েকটি বিশ্ব-রেকর্ডের সঙ্গে তোমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। সবচেয়ে কম বয়সে টেস্টে 'ডবল' অর্জনের বিশ্ব-রেকর্ড কপিলের। আবির্ভাব থেকে একটানা (বাদ না গিয়ে) টেস্ট খেলার বিশ্ব-রেকর্ড এতদিন ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোহন কানহাইয়ের (৬১টি টেস্ট)। সেটি ভাঙলেন কপিল। শুধু তাই নয়, একটানা খেলার সুবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিল ওরিলি ১৪৪টি উইকেট নিয়ে যে বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছিলেন, সেটিও ভেঙেছেন তিনিই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ক'দিন আগে আমেদাবাদে কপিল ন'টি উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ৮৩ রানে। পৃথিবীর কোনো ক্যাপ্টেনেরই এমন দুর্ধর্ষ বোলিং-কৃতিত্ব নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত অল-রাউণ্ডার ক্লাইভ রাইস অবশ্য টেস্ট খেলেননি। কিন্তু নটিংহামশায়ারের পক্ষে কাউন্টি ক্রিকেটে অসাধারণ ক্রিকেটে খেলেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৮০ সালে তিনি উইজডেনের স্বীকৃতি পান।

এই সিঙ্গল উইকেট টুর্নামেন্টে নিয়ম ছিল প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই বাকি চারজন বল করবেন চার ওভার করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ব্যাট করবেন মোট ১৬ ওভার। মোট রানসংখ্যাকে আউটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে প্রাপ্ত উইকেটের সংখ্যা দিয়ে গুণ করেই হিসেব হবে পয়েন্টের। এই টুর্নামেন্টে নিরাশ করেছেন হ্যাডলি এবং মার্শাল। এঁরা দুজনেই কোনো উইকেট পাননি। বথাম হয়েছেন তৃতীয়, কারণ ১৬৩ রান করলেও আউট হয়েছেন তিনবার (পয়েন্ট ৫৪·৩৩)। শেষ পর্যন্ত কপিল যখন ব্যাট করতে নামেন তখন ১৬ ওভারে আউট না হয়ে ৯২ রান করার দরকার ছিল। কিন্তু কপিল ১১৮ রান করলেও চারবার আউট হন। ফলে ১১৮ পয়েন্ট পেয়ে কপিল হলেন দ্বিতীয়। প্রথম স্থানটি অধিকার করেন ক্লাইভ রাইস। আউট না হয়ে ৭৩ রান আর সেইসঙ্গে সাত উইকেট নেওয়ায় তাঁর অর্জিত পয়েন্টের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১১।

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন

সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

ANANDAMELA 31 OCTOBER 1984 REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS (C)/731

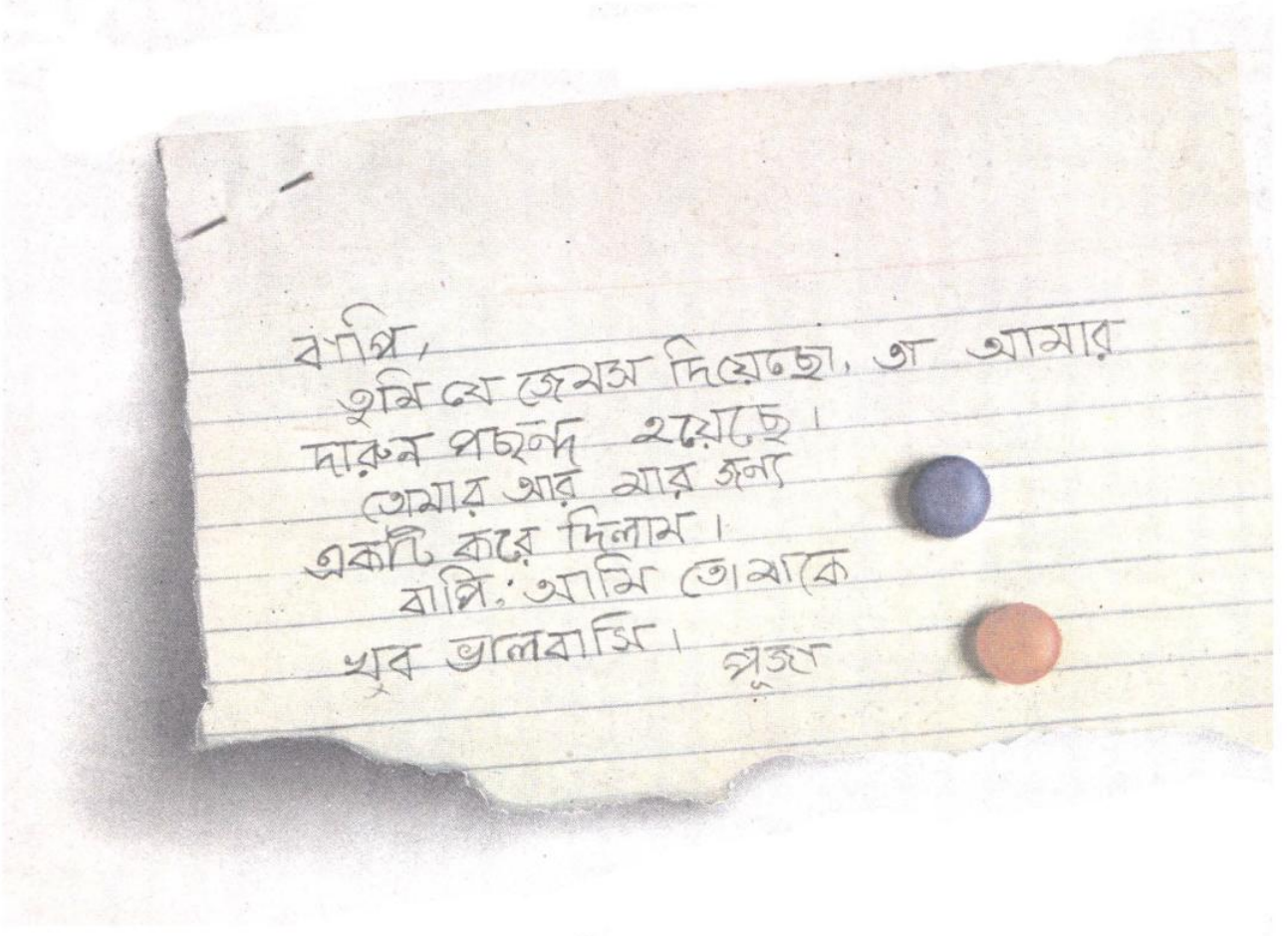

আজ যখন তুমি জেম্‌স আনবে ঘরে
দেখবে কি মজায় মন উঠবে ভরে
ছোটখাটো দেখতে চকলেটে ঠাসা
খেলতে আর খেতে পাবে মজা খাসা